শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ.
শাইখ জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি

আকাবিরদের জ্ঞান-সাধনার গল্প

[আকাবিরদের জ্ঞান-সাধনার গল্প]

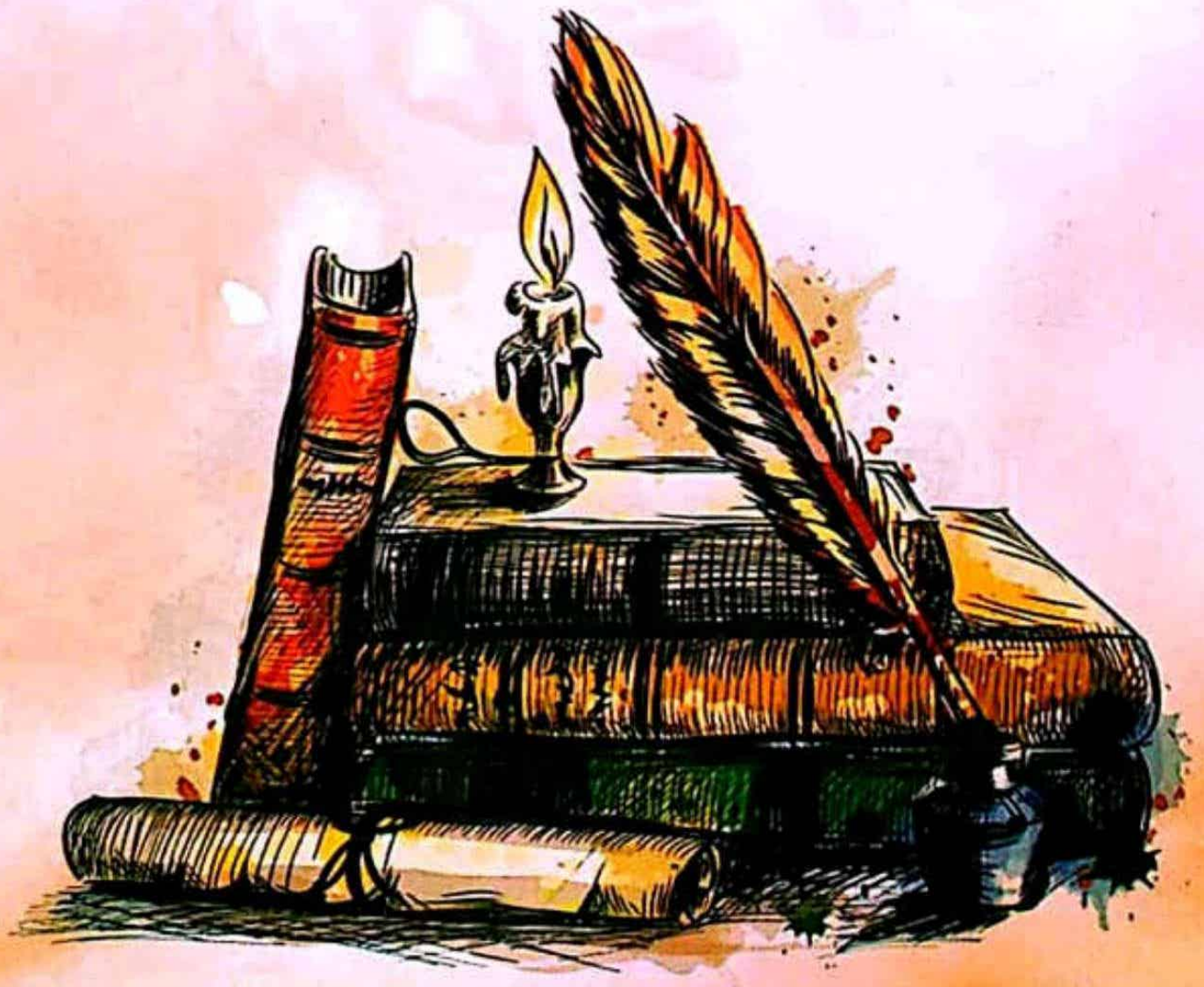

প্রকাশকের কথা

পূর্বসূরির ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলে গেলে যেকোনো জাতি খুব সহজেই দুমড়েমুচড়ে যায়। হারিয়ে ফেলে নিজ স্বকীয়তা। এভাবেই আস্তে আস্তে নিজ পরিচয় খুইয়ে আত্মপরিচয়হীন এক জাতিতে পরিণত হয়। মেরুদণ্ড সোজা করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বিলুপ্ত হয়ে যায় জগৎ এবং মানুষের স্মরণ থেকে।

ইসলামের বদৌলতে আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা এমন অনেক পূর্বসূরি দান করেছেন, যাদের ইতিহাস আজও আমাদের উজ্জীবিত করে। তাদের খোদাভীরুতা, ইলমপিয়াসা, দ্বীনদারিতা, অবিচলতা, বীরত্ব—আমাদের এমন কর্মপন্থা এবং দর্পণ তুলে ধরে—যার অনুসরণ আমাদের ইলমি যোগ্যতা, আমলি দৃঢ়তা, বীরত্ব এমন স্তরে উন্নীত করবে—দুনিয়ার অন্য কোনো জাতি চোখ তুলে তাকানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

সেইসব পূর্বসূরিদের জীবনকথা এবং তাদের চেষ্টা-সাধনার গল্প দিয়েই সাজানো হয়েছি অমূল্য এই গ্রন্থটি। তাদের ইলমি সাধনা, ত্যাগ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার সবক পাবেন বইটিতে; যা আপনাকে ইলম অর্জনের সফরে করবে আরও উজ্জীবিত এবং পুলকিত। ইলমি সফরের পাথেয়ের সন্ধানে অবগাহন করতে পারেন বইটিতে। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন। আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন।

বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন এবং বইটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা দান করুন। আমিন।

—প্রকাশক
দারুত তিবইয়ান

সূচিপত্র

কারা আমাদের পূর্বসূরী-১৫

চূড়ান্ত সাবধানতা একেই বলে ১৬
ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সতেরো হাদিস..... ১৬
তোমার লজ্জাহীনতা আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে..... ১৭
সিজদা থেকে মাথা উঠাব কীভাবে? ১৭
অযুর সাথে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া... ..... ১৮
ইবাদতের মৌসুমে আকাবিরদের সাধনা..... ১৮
প্রহারও আল্লাহর জন্য ১৯
অবিচলতা ২০
দুনিয়াবিমুখতা ২০
অভাব ও দীনতা..... ২০
সম্পদের প্রতি অনীহা ২১
আত্মার খোরাক..... ২১
অল্প হাসি বেশি কান্না ২১
আল্লামা জালালুদ্দিন রুমি রহ.-এর নামাজ ২২
চিরুনি আনতেও নিয়ত!..... ২২
ইবনে কুদামা হাম্বলি রহ.-এর ওসিয়ত ২২
হজরত ইবনে মাসউদ রাদি.-এর লজ্জাবোধ ২৩
ইমাম শাফেয়ি রহ. রাতকে তিন ভাগ করে নিতেন ২৪
ইবনুল বাগদাদি কেবল অপরাগ হয়েই ঘুমাতেন ২৪
ইয়াকুব নাজিরামি রহ. হাঁটতে কিতাব পড়তেন ২৪
ইবনে সাইদ আন্দালুসি রহ. মনে করেন, ইলম অর্জনের মধ্যেই
তার শান্তি বিরাজমান..... ২৬
ইবনে মালেক রহ. মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কবিতার আটটি চরণ শুনে

শুনে মুখস্থ করেছেন..... ২৯
ইমাম নববি রহ. দু-বছর পর্যন্ত বিছানায় পিঠ লাগাননি..... ২৯
ইমাম নববি রহ. রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার খেতেন.... ৩০
খাবার, পোশাক ও জীবনযাপনে ইমাম নববি রহ.-এর
অনাড়ম্বরতা ও অমসৃণতা..... ৩০
ইমাম নববি রহ. সামান্য সময় ঘুমাতেন; যখন ঘুম প্রবল
আকার ধারণ করত ৩১
ইমাম নববি রহ. 'আল-ওয়াসিত' কিতাবটি চারশ বার পাঠ করেছেন .. ৩১
ডাক্তার ইবনুন নফিস রহ. চিকিৎসাবিজ্ঞান, ফেকাহ ও সময়
সংরক্ষণে ঈর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন..... ৩১
ইবনুন নফিস রহ. ফজর পর্যন্ত সারা রাত ইবনে ওয়াসেল
রহ.-এর সাথে ইলমি আলোচনা করেছেন..... ৩৩
শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. অসুস্থতা ও সফরের সময়ও অধ্যয়ন
ও ইলম চর্চা করতেন ৩৩
বয়োজ্যেষ্ঠ হাফেজে হাদিস ইবনুশ শিহনাহ হাজ্জার রহ. একশ
বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর একটু আগেও ছাত্ররা তার কাছে পড়েছে..... ৩৪
সুলতানুল উলামার পৌত্রী মৃত্যুর দিনও হাদিস পড়িয়েছেন..... ৩৪
শামসুদ্দিন আসবাহানি কম খেতেন, যেন বাথরুমে যাতায়াতের
কারণে সময় নষ্ট না হয় ৩৫
ইবনে রজব হাম্বলি রহ.-এর ইলম চর্চায় চরম তন্ময়তা ৩৬
ইমাম মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধি রহ. সফরাবস্থায়ও লিখতেন
এবং নুসখা তৈরি করতেন..... ৩৬
আল্লামা আব্দুল্লাহ বালাবি রহ. বাসর রাতেও কিতাব অধ্যয়নে মগ্ন ছিলেন,
নববধূর প্রতি আদৌ তাকিয়ে দেখেননি..... ৩৭
আব্দুল হাই লখনোবি রহ. মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন
অথচ তার লিখিত কিতাবের সংখ্যা ১১০ ছাড়িয়ে গেছে..... ৩৮
জামালুদ্দিন কাসেমি রহ. মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন,
অথচ রেখে গেছেন একশরও অধিক রচনাবলি ৩৮
শায়খ তাহের জাজায়েরি রহ.-এর সময় সংরক্ষণ ও ইলম অর্জনের
জন্য বিনিদ্র রজনি যাপন ৪০
হাকিমুল উম্মত থানবি রহ.-এর লিখিত পুস্তকাদির সংখ্যা
হাজারেরও অধিক ৪১

শায়খ জাহাবি ও শায়খ তব্বাখ রহ. মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্বেও কিতাব অধ্যয়ন করেছেন..... ৪২
ইবনে আসাকের রহ.-এর শ্রোত হাদিসের কপিগুলো পৌঁছতে বিলম্ব হওয়া ও না পৌঁছা পর্যন্ত এর জন্য তার চরম অস্থিরতা..... ৪৩
সময় সংরক্ষণের গুরুত্ব ও সময় নষ্ট করার ভয়াবহ পরিমাণ সম্পর্কে বিখ্যাত মিশরীয় সাহিত্যিক আহমদ আমিনের একটি প্রবন্ধ.... ৪৪
সময়টাই জীবন এবং সময় স্বর্ণের চেয়েও দামি ৪৭
সময়টা নগদ সম্পদ, সময়টা কর্তনকারী তরবারি..... ৫০
সময়ের সদ্ব্যবহার ও কাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ গাজালির অমূল্য বাণী..... ৫৩
সময়ের তুলনায় কাজ অনেক বেশি। সময় নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকে না। সে হয়তো খাঁটি বন্ধু নয়তো ভয়ানক শত্রু..... ৫৫
দীন ও দুনিয়ার প্রত্যেক কাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করার গুরুত্ব ৫৮
নিরর্থক ও বেহুদা আলোচনা মানুষকে বড়ো গোনাহে লিপ্ত করে..... ৫৮
লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতার শিক্ষা ৫৯
প্রত্যেক কাজ সীমার মধ্যে থেকে করার প্রয়োজনীয়তা..... ৬০
দেওবন্দের বিশিষ্ট মুরব্বিগণের মাঝে আল্লাহ পাকের ভয় ও বিরোধীদের সাথে আচরণ..... ৬১
হুজ্জাতুল ইসলাম হজরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম রহ..... ৬২
ঋণগ্রস্ততার অস্থিরতা ও হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর পরামর্শ..... ৬৩
আল্লাহর ভয় ও নম্রতার মাহাত্ম্য ও পরামর্শের গুরুত্ব..... ৬৪
প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা থেকে সৃষ্ট কিছু সন্দেহ ও ভুল ধারণার মূল ভিত্তি ৬৫
একজন কলেজ ছাত্রের কাহিনি ৬৬
অপর এক ছাত্রের ঘটনা ৬৮
আল্লামা শিবলি নুমানি রহ.-এর কথা ৬৯
হজরত জুনাইদ বাগদাদি রহ.-এর ঘটনা..... ৭০
সম্পদের দ্বারা আত্মশুদ্ধি..... ৭১
একটি উপদেশমূলক ঘটনা..... ৭১
পূর্ববর্তী মাশাইখগণের প্রতি আদব..... ৭২
শাহ ইসহাক সাহেব রহ.-এর একটি আশ্চর্য ঘটনা..... ৭৩
ইমাম আবু ইউসুফ রহ. মৃত্যুর সময়ও একটি ফিকহি মাসাআলা

নিয়ে আলোচনা করেছেন..... ৭৪
ইমাম জাহেজ, ফাতাহ ইবনে খাকান ও কাজি ইসমাইল রহ.-এর ইলমস্পৃহা..... ৭৫
ইবনে সুহনোন রহ.-কে তার বাঁদি রাতের খাবার খাইয়ে দিয়েছে, কিন্তু তিনি রচনার ব্যস্ততায় মুগ্ধতার কারণে টের পাননি ৭৬
পূর্বসূরি আলেমদের রাত্রিজাগরণ ও ইলমের জন্য বিদগ্ধ হওয়ার ঘটনা..... ৭৭
কুফার বিখ্যাত নাহুবিদ ইমাম সালাব রহ. নব্বই বছর বয়সেও হাঁটতে হাঁটতে কিতাব পড়তেন, ফলে একটি গর্তে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয় ৭৭
ইবনে জারির রহ. এর সময় বাঁচানো ও ত্রিশ হাজার পাতায় তাফসির লেখার ইচ্ছা পোষণ..... ৭৭
ইবনে জারির রহ.-এর ত্রিশ হাজার পাতায় ইতিহাস গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা ৭৮
ইবনে জারির রহ. দৈনিক চল্লিশ পাতা লিখতেন..... ৭৮
ইবনে জারির রহ. সর্বমোট ৩৫৮ হাজার পাতা লিখে গেছেন..... ৭৯
ইবনে জারির রহ.-এর সময় ও কর্মের বিন্যাস ৭৯
মৃত্যুর মাত্র এক মুহূর্ত পূর্বে ইবনে জারির রহ. একটি দুআ লিখেছেন .. ৮০
লিখিত কিতাবাদি ও স্বীয় অক্ষয় কীর্তিসমূহের মাধ্যমে ইবনে জারির রহ. অমর হয়ে আছেন..... ৮০
ইসলামি গ্রন্থভান্ডার সমৃদ্ধকরণে হাফেজ ইবনে আসাকের রহ.-এর বিশাল অবদান..... ৮১
ইবনে আসাকের রহ.-এর গগণচুম্বী মনোবল ও মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ..... ৮২
ইবনে আসাকের রহ.-এর ইলমের জন্য একাগ্রতা, তার শায়খ ও শায়খার আধিক্যতা, এবং তার আয়ত্তশক্তি ৮৩
ইবনে আসাকের রহ.-এর শ্রোত হাদিসের কপিগুলো পৌঁছতে বিলম্ব হওয়া ও না পৌঁছা পর্যন্ত এর জন্য তার চরম অস্থিরতা ৮৫
ইমাম মুসলিম রহ. -এর মুতালাআর নিমগ্নতা ৮৬
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ-এর ইলমি মজলিস ৮৭
ইলমের প্রতি আকর্ষণ তো একেই বলে... ..... ৮৭
ইলমের আকর্ষণে ঘুম উড়ে যায়..... ৮৮
জ্ঞানার্জনের মেহনত..... ৮৮
অন্তিম মুহূর্তেও ইলমের প্রতি আকর্ষণ..... ৮৯
যে পথের পথিক আমরা..... ৮৯

ইলমের তৃষ্ণায় জেলখানায় অবস্থান..... ৯০
ইলমের পিপাসা এমনও হয়? ৯১
ফতওয়া পড়তে পড়তে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন ৯১
এমনও জ্ঞানপিপাসু ছিল তখন..... ৯২
চিঠির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতাম না ৯২
যে কলমের বিশ্রাম নেই ৯৩
সফরের প্রবল আগ্রহ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ৯৪
দরসের প্রতি আগ্রহের অনন্য দৃষ্টান্ত..... ৯৫
নেতৃত্বের ভুল জাতির ধ্বংসের কারণ ৯৬
হজরত আবু হুরায়রা রাদি. মুখস্থশক্তি কোথায় পেলেন? ৯৭
মুখস্থ তো এমনই হওয়া চাই..... ৯৭
হাদিসের হাফেজ এমনও ছিলেন... ..... ৯৮
ফকিহগণের তীক্ষ্ণ মেধা..... ৯৯
ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জ্ঞানের সূক্ষ্মতা..... ৯৯
হজরত ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সামনে খলিফা মানসুর..... ১০১
এক হাদিস থেকে ৪০টি মাসআলা ইসতিম্বাত..... ১০২
শায়খুল হিন্দ রহ.-এর মুখস্থশক্তি ১০৩
বিরল মুখস্থশক্তি ১০৩
মুখস্থশক্তির পূর্ণতা..... ১০৪

আকাবিরদের জ্ঞান-সাধনার গল্প

কারা আমাদের পূর্বসূরি

'আকবার' শব্দের বহুবচন 'আকাবির'। পূর্ববর্তী সম্মানিত, অনুসরণীয় উলামায়ে কিরামকে আকাবির বলা হয়। আরবি 'আকাবির' শব্দটির উর্দু অর্থ بڑے لوگ- مقدر آدمی/অর্থাৎ বড় ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত ব্যক্তি।

যে সমস্ত উলামায়ে কিরাম দ্বীনের জন্য চেষ্টা-মুজাহাদা, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং দ্বীনি ইলমে অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন—তাদেরকেই আকাবির বলে সম্বোধন করা হয়। তাদের জীবনে রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিভিন্ন অংশ। গ্রহণীয় নানান পাঠ-বৈচিত্র।

ইলমি এবং ব্যক্তিগত জীবনে তারা আমাদের সামনে এমন নিদর্শন উপস্থাপন করে গিয়েছেন—যা আমাদের যাপিত জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারলে ইলমি এবং আমলি জীবনে নিদর্শন স্থাপনে যথেষ্ট প্রমাণিত হবে এবং আমাদের উত্তরসূরিদের জন্যও উত্তম পাথেয় জুটবে।

আমাদের আকাবিররা তাদের পূর্বসূরিদের অনুসরণ করেছেন, তাদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। নিজেদের জীবনে ইলম এবং আমলের সমন্বয় সাধন করেছেন। আজ তারা আমাদের মাঝে আঁধার রজনীর নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে দীপ্তময় আভা ছড়াচ্ছেন।

কিন্তু আকাবিরদের জ্ঞান-সাধনা এবং তাদের ইলমি জীবনের শিক্ষা এবং অনুসরণ থেকে আজ আমরা বঞ্চিত। আমাদের মাঝে ইলম অন্বেষণের তাগিদ শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। পরিণামে আমাদের ইলমে বরকত কমে গিয়েছে, মূর্খতা, অজ্ঞতা আমাদের সম্পূর্ণ-রূপে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে।

আকাবিরিনে কিরাম ইলমের জন্য মুখিয়ে থাকতেন। জানার তাগিদে উস্তাদদের নিকট বারবার ধরনা দিতেন। ইলমের জন্য দীর্ঘ রাত-দিন সাধনা করতেন। বিপরীতে আমাদের

ইলম অন্বেষণ হয়ে গেছে বন্দি পাখির মতো। দিন-সময় নির্ধারণ ছাড়া ইলমের তৃষ্ণা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বন্দি কুটিরে লুপ্তপ্রায় অবস্থা ধারণ করেছে।

আকাবিরদের ইলমি জীবনের পাঠ আমাদের মাঝে উন্মেষ ঘটাতে পারে ইলমে অহির তৃষ্ণা। অন্বেষা করে তুলে পারতে ইলমের প্রতি। জাগতিক জ্ঞানের বিপরীতে ইলমে অহির আলোয় নিজেদের আলোকজ্জ্বল করে তুলতে পারে। আর এভাবেই ইলমে অহির বরকত আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করতে পারে।

আকাবিরদের জীবনের পাঠ ইলমে অহির পিয়াসা নিবারণে; তাদের মতো আমাদেরও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ইলম অর্জনে সহায়ক হতে পারে। ইলমের আসক্তি জাগাতে পারে। এভাবেই আমরা আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারি ইলমের জন্য। ইলমে অহির জন্য। নিতে পারি মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্তি।

আর সেসব আকাবিরিনে কিরামের ঈর্ষণীয় কিছু ঘটনাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

চূড়ান্ত সাবধানতা একেই বলে

মানুষের উচিত ইবাদতের ওপর গর্ব না করা এবং নিজের ব্যাপারে আস্থাশীল না হওয়া। একবার কেউ হজরত উমর রাদি.-কে দরজার চৌকাঠের ওপর বসে থাকতে দেখল। লোকটি তাঁকে সালাম দিয়ে সামনে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে ফেরার পথে দেখতে পেল, এখনো উমর রাদি. চৌকাঠের ওপর সেভাবেই বসা আছেন। লোকটি পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি দরজার ওপর সে কখন থেকে বসে আছেন!' তিনি জবাবে বললেন, 'আমার মেয়ে হাফছা, উম্মুল মুমিনিন। সে আজ আমার বাড়ি এসেছে, কিন্তু আমার স্ত্রী বাড়িতে নেই, যে কারণে সে ঘরে একা। তাই তাঁর পাশে বসার পরিবর্তে আমি দরজার এখানে বসতে ভালো মনে করেছি।' আল্লাহু আকবার!

আমাদের আকাবিরগণ বিতাড়িত শয়তান থেকে এ পরিমাণ সতর্ক থাকতেন। শয়তানের চালবাজি বোঝা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার রহমত সঙ্গে না থাকলে কখন যে সে মানুষকে ভ্রষ্ট করে বসবে টেরও পাওয়া যাবে না!

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সতেরো হাদিস

বিদেশে একবার এক লোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। সে আমাকে বলল, 'ইমাম আবু হানিফা রহ.[১] মাত্র সতেরোটি হাদিস জানতেন। তারপরও আপনারা

---

১. তাঁর নাম—নুমান ইবনে সাবিত। আবু হানিফা তাঁর লকব। তিনি ৮০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৫০ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর দিন হজরত ইমাম শাফি রহ. জন্মগ্রহণ করেন।

নিজেদেরকে হানাফি বলেন?' আমি বললাম, 'আপনার কথা শুনে তো আমি ১০০% থেকে ১০১% হানাফি হয়ে গেলাম।' সে বলল, 'মানে।' আমি বললাম, 'এটা তো সত্য যে হজরত আবু হানিফা রহ.-এর নেতৃত্বে ছয় লক্ষাধিক মাসআলা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং যে মনীষী মাত্র সতেরোটি হাদিস থেকে ছয় লক্ষ মাসআলা বের করতে পারেন, তাঁর অনুসরণ না করে, তাকে ইমাম না মেনে উপায় আছে? তাঁকে কী করে শ্রদ্ধা না করে পারা যায়? তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারাটা আমি সৌভাগ্যের কারণ মনে করি। এসব কথা শুনে লোকটি নিজেকে শুধরে নিল। বলল, 'আসলে হজরত আবু হানিফা রহ.-কে আল্লাহ তাআলা এমন উচ্চ মাকাম দান করেছেন যে, তা বোঝাও কঠিন।

তাফসির সম্পর্কে এ কথা ভালো করে জেনে নিন, পবিত্র কুরআন শরিফের ওই অর্থই গ্রহণযোগ্য যা ওলামায়ে কেরাম করেছেন। তাঁদের সাহচর্যে থেকেই অর্থ উদ্ধার করতে হবে। শুধু কিতাব পড়লে হবে না। সকলের জ্ঞান-বুদ্ধি এক নয়। আমাদের আকাবিরগণ যা বুঝতে পারতেন আমরা তা বুঝতে পারি না। এ জন্য তাঁদেরকে মেনেই আমাদের চলতে হবে। যেমনটি হাদিসে এসেছে : 'আকাবিরদের সাথেই তোমাদের বরকত।'[২]

তোমার লজ্জাহীনতা আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে

যদি আমরা আমাদের আকাবির ও আসলাফদের জীবনীর দিকে দৃষ্টি দিই, তবে তাঁদের জীবনে দুর্লভ অনেক কিছুই দেখতে পাব। ইমাম আবু হানিফা রহ. একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। এক লোক গোসলখানা থেকে গোসল করে বের হলো। সে এমন লুঙ্গি পরা ছিল যা হাঁটুর ওপরে ছিল; অর্থাৎ শরীরের যে অঙ্গগুলো ঢেকে রাখা ফরজ তা খোলা ছিল। হজরত ইমাম আবু হানিফা রহ. সাথে সাথে তাঁর চোখ বন্ধ করে নিলেন। লোকটি কাছে এসে বলতে লাগল, 'নুমান! আপনি কবে থেকে অন্ধ হয়েছেন?' ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, 'যখন থেকে তোমার লজ্জা-শরম বিদায় নিয়েছে তখন থেকে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি।'

সিজদা থেকে মাথা উঠাব কীভাবে?

হজরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহি রহ. নামাযে দীর্ঘ সময় সিজদায় কাটাতেন। একবার তাকে কেউ দীর্ঘ সিজদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি

---

[২]. খুতুবাতে জুলফিকার : ৪/১৭।

বললেন, 'আমি যখন সিজদায় যাই তখন আমার মনে হয়, আমি কি পরবর্তী সিজদা দিতে পারব? এ চিন্তা থেকেই সিজদা থেকে মাথা উঠাতে মন চায় না।'

হজরত ইয়াহইয়া রহ.-ও এমন করতেন। দীর্ঘ সিজদার ব্যাপারে তাঁকেও যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, এক বর্ণনায় এসেছে : 'সিজদাকারী আল্লাহর পায়ের ওপরই সিজদা করে থাকে।' তাই যখন আমি সিজদা করি, তখন আমার মনে হয়, আমি তো আল্লাহর পায়ের ওপরই সিজদা করছি। তাই মাথা উঠাতে মন চায় না।'[৩]

অযুর সাথে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া...

একবার আমার হজরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি রহ.-এর পরিবারের এক সন্তানের বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। গিয়ে দেখলাম, তাঁদের বাচ্চারা বাড়ির আঙিনায় ফুটবল খেলছে। নতুন বাড়ি। বাড়ি থেকে মসজিদ দূরে হওয়ায় তারা বাড়িতেই নামাজ আদায় করে। ইতিমধ্যে নামাজের সময় হয়ে গেল। মাগরিবের নামাজের আজান দেওয়া হলো। জামাতের জন্য আমরা কাতার সোজা করলাম। ছোটো-বড়ো সবাই জামাতে শামিল হলো। আমি ঘরের প্রধানকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা অযু করবে না?' তিনি বললেন, 'এদের অযু আগে থেকেই আছে। অযু করেই তারা খেলতে গিয়েছিল।' নামাজ শেষ হওয়ার পর তিনি আরও বললেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে এ নিয়ম চলে আসছে যে, চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই বাচ্চাদের জাগ্রত অবস্থায় সর্বদা অযুর সাথে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়।'

পৃথিবীর এমন নাজুক সময়েও অনেকের মনে সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার ইচ্ছা রয়েছে। জীবন যেভাবে পরিচালিত হবে, মৃত্যু সেভাবেই আসবে। সুতরাং সর্বদা অযুর সাথে থাকলে মৃত্যুও অযুর ওপরই হবে।[৪]

ইবাদতের মৌসুমে আকাবিরদের সাধনা

হজরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহ. রমজান মাসে এত সময় নিয়ে তারাবির নামাজ পড়তেন যে, সেহরির সময় হয়ে যেত। সেহরির পর ফজরের নামাজ আদায় করতেন। এভাবে সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন।

---

৩. তামান্নায়ে দিল : ১২২।

৪. খুতুবাতে জুলফিকার, পৃ. ৫/১২৫।

তাঁর স্ত্রী তাঁর শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার চিন্তা করলেন। বললেন, 'একদিন অন্তত বিশ্রাম নিন।' কিন্তু তিনি চিন্তা করতেন, আগামী রমজানে কে থাকবে, আর কে থাকবে না, তা তো আর কারও জানা নেই। তাই তিনি সারা রাত এভাবে ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এভাবে রমজানের প্রথম দশক অতিবাহিত হয়ে যায়।

হজরতের স্ত্রী একদিন একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ছোট বাচ্চাকে কারি সাহেবের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন যে, 'কারি সাহেব! আপনি একদিন হজরতের কাছে ওজর পেশ করবেন যে, আমার শরীর ভালো না। বিশ্রামের প্রয়োজন। তাতে হয়তো তিনিও একদিন বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।' কারণ, বিবি সাহেবা জানতেন যে, হজরত অন্যের সমস্যা সমাধানে খুব গুরুত্ব প্রদান করেন।

এ খবর শুনে কারি সাহেব বললেন, 'এটা তো অনেক ভালো খবর। তিনি আমার শায়েখ ও মুরশিদ। আমার এ ওজরের দ্বারা যদি তাঁর বিশ্রামের সুযোগ হয়, তাহলে আজ রাতেই হজরতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করব।'

পরিকল্পনামাফিক রাতে কারি সাহেব বললেন, 'হজরত! আজ আমার শরীর ক্লান্ত। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। খুব বেশি তিলাওয়াত করতে পারব না।' হজরত বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি অল্প তিলাওয়াত করে নামাজ শেষ করুন।' নামাজ শেষ হলে হজরত বললেন, 'আপনি যেহেতু ক্লান্ত সেহেতু আর বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই, আমার বিছানায় শুয়েই আরাম করুন। বাতি-জানালা বন্ধ করে দিন।' কারি সাহেব বাধ্য হয়েই হজরতের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কারি সাহেব বলেন, 'কিছুক্ষণ পর আমার ঘুম ভেঙে গেল, হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম, কেউ আমার পা টিপছে। আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখি আমার শায়েখ ও মুরশিদ আমার পা টিপে দিচ্ছে। আমি বললাম, 'হজরত! এ কী করছেন?' তিনি বললেন, 'আমি ভাবলাম, আপনি তো অসুস্থ, হয়তো পা টিপে দিলে একটু ভালো লাগবে।' আমি বললাম, 'আপনি যদি রাত জেগেই কাটাতে চান তাহলে চলুন, আমি তিলাওয়াত করছি, আপনি শুনুন। তাতেই রাত কেটে যাবে।' হজরত খুব খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি জায়নামাজ বিছিয়ে বসলেন। আমি তিলাওয়াত করতে থাকলাম, আর তিনি শুনতে থাকলেন। আল্লাহু আকবার!

প্রহারও আল্লাহর জন্য

হজরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবি রহ. আমাদের আকাবিরদের মাঝে অন্যতম এক ব্যক্তি। একবার তিনি এক বাচ্চাকে অপরাধের কারণে শাস্তি দিচ্ছিলেন। দু-

চারটি থাপ্পড় দিলেন। ব্যথা পেয়ে ছেলেটি বলল, 'আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিন।' হজরত তখন বললেন, 'আরে আল্লাহর বান্দা! আমি তো তোমাকে আল্লাহর জন্যই প্রহার করছি।'

তাঁদের রাগের মুহূর্তের শাস্তিও ছিল আল্লাহর জন্য।[৫]

অবিচলতা

একবার হজরত হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে আলেমগণের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। অন্য এক মজলিসে তিনি বলেন, যখন আমি ১৯২৩ সনে করাচির জেলখানায় ছিলাম, তখন বাংলার কাউন্সিলের এক সদস্য আমাকে বলল, চল্লিশ হাজার রুপি নগদ আর মাসিক পাঁচশ রুপি বেতনে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর পদে আপনাকে প্রস্তাব করছি। আপনি তা গ্রহণ করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার দায়িত্ব কী? তিনি বললেন, কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু আজাদির আন্দোলনে চুপ থাকবেন। তিনি বললেন, হজরত শায়খুল হিন্দ রহ. যে মিশনে আমাকে লাগিয়েছেন, তা থেকে সরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দুনিয়াবিমুখতা

হজরত জাকারিয়া রহ.-কে চট্টগ্রাম অথবা ঢাকার মাদরাসা আলিয়াতে শায়খুল হাদিস পদে যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। শুধু তিরমিজি ও বুখারি পড়ানোর কথা ছিল। মাসিক বেতন ছিল বারোশ রুপি। প্রথমে চিঠি পাঠানো হয়। তারপর জরুরি তারবার্তা পাঠানো হয়। তিনি বলেন, 'তারবার্তার জবাবে আমি শুধু লিখেছি, যেসব বন্ধুগণ আপনাদের কাছে আমার নাম প্রস্তাব করেছে, তারা শুধু ভালো ধারণার ওপর ভিত্তি করে এ কাজ করেছে। অধম এর উপযুক্ত নয়।'

অভাব ও দীনতা

হজরত জাকারিয়া রহ. বলেন, 'আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরিরা যে রকম অভাব-অনটন এবং ধৈর্য ও শুকরিয়ার সাথে দিন কাটাতেন, এর কোনো দৃষ্টান্ত

---

[৫]. খুতুবাতে জুলফিকার : ৬/৩০।

নেই। তিনি স্বীয় চাচা মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, 'একবার তিনি আমাকে লিখলেন, কয়েকদিন যাবৎ তোমার কাছে একটি চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার কাছে কোনো পয়সা ছিল না। কারও কাছ থেকে ধার নিতেও মন চাচ্ছিল না। আজ আল্লাহ পয়সার ব্যবস্থা করলেন। তাই তোমাকে চিঠি লিখছি।'

সম্পদের প্রতি অনীহা

একবার হজরত খায়ের নাসসাজ রহ. বলেন, আমি এক মসজিদে প্রবেশ করলে জনৈক দরবেশ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হে শেখ! আমার প্রতি মেহেরবানি করুন। আমার জন্য দোয়া করুন। আমার সম্মুখে একটি বড়ো বিপদ উপস্থিত। অর্থাৎ, বালা-মুসিবত আমার ওপর পতিত হয়েছে। আমি তাকে আল্লাহর নিয়ামতরূপেই বরণ করে নিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে নিয়ামত আমার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হজরত খায়ের নাসসাজ রহ. বলেন, 'আমি তার অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করে বুঝতে পারলাম, অপ্রত্যাশিতভাবে সে একটি দিনার পেয়েছে। এতেই সে অস্থির হয়ে পড়েছে।'

আত্মার খোরাক

একবার হজরত জাকারিয়া রহ. ইশকের সংজ্ঞা এভাবে ব্যক্ত করেন যে, যখন সবকিছু বের হয়ে কোনো একটির মধ্যে সব ভালোবাসা একত্রিত হয়ে যায়, তখন তাকে ইশক বলে। দীনের ব্যাপারে হজরতের ইশক এ রকমই ছিল। এ বিষয়ে তাঁর রুহের সাথে একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা তাঁর বাহ্যিক অনুভূতি ও স্বাভাবিক পছন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর দ্বারা তাঁর মাঝে ওই শক্তি, অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল, যা মানুষের খাদ্য দ্বারা অর্জিত হয়।

অল্প হাসি বেশি কান্না

একবার হজরত আবু বকর কাতানি রহ. বললেন, আমি একজন সুদর্শন যুবককে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে?' সে বলল, 'আমি পরহেজগারি।' আমি বললাম, 'তুমি কোথায় থাকো?' সে বলল, 'চিন্তিত লোকদের অন্তরে।' কিছুক্ষণ পরে আমি ভয়ংকর আকৃতির একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে?' সে বলল, 'আমি গোনাহ ও নাফরমানি অর্থাৎ, হাসি-তামাশা।' আমি বললাম, 'তুমি কোথায় থাকো?' সে বলল, 'আমোদ-

প্রমোদকারীদের অন্তরে।' আমি জাগ্রত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, হাসির প্রবল কারণ না হলে আমি আর কখনো হাসব না।

আল্লামা জালালুদ্দিন রুমি রহ.-এর নামাজ

নামাজের সময় হলেই আল্লামা জালালুদ্দিন রুমি রহ. কিবলার দিকে ফিরে যেতেন। তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। নামাজ পড়া শুরু করলে সম্পূর্ণরূপে নামাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। তাঁর খাদেম বলেন, 'অনেকবার আমি স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি যে, তিনি ইশার নামাজ প্রথম ওয়াক্তেই পড়ে ফেলতেন। অতঃপর ইশার প্রথম ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকতেই নফল নামাজের নিয়ত বেঁধে নামাজে এমনভাবে মগ্ন হতেন যে, দু-রাকাত নামাজ শেষ করতেই ভোর হয়ে যেত।'

চিরুনি আনতেও নিয়ত!

আমাদের আকাবিররা প্রতিটি কাজের শুরুতেই নিয়ত করতেন। বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি ঘরের ছাদে বসে মাথা ম্যাসেজ করছিলেন। হঠাৎ স্ত্রীকে ডেকে তার চিরুনি এনে দেওয়ার জন্য বললেন। স্ত্রী বলল, 'আয়নাও কি নিয়ে আসব?' তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'ঠিক আছে নিয়ে আসো।' স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন কেন? আর আয়নার ব্যাপারেও এত ভাবলেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমি একটি নিয়ত করে তোমাকে চিরুনি আনতে বলেছিলাম, যখন তুমি আয়নার কথা বললে, তখন আমার কোনো নিয়ত ছিল না, আমি এ জন্যই কিছু সময় চুপ ছিলাম যাতে এটার জন্য আমি কোনো একটা ভালো নিয়ত করতে পারি।'[৬]

ইবনে কুদামা হাম্বলি রহ.-এর ওসিয়ত

ইমামে রব্বানি মুওয়াফফাকুদ্দিন ইবনে কুদামা, হাম্বলি, বিখ্যাত হাম্বলি ফকিহ ও আল-মুগনি কিতাবের লেখক আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ, (জন্ম : ৫৪১ হি., মৃত্যু : ৬২০ হি.)-এর একটি অত্যন্ত উপকারী ও ব্যাপক ওসিয়তনামা দ্বারা আমার পুস্তিকাটি সমাপ্ত করতে চাচ্ছি। নিম্নে তার ওসিয়তনামাটি তুলে ধরা হলো—তিনি তাঁর ওসিয়তনামার শুরুতে বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, তুমি

---

৬. আওয়ারিফুল মায়ারিফ : ৪৯৭।

নিজের মূল্যবান জীবনটাকে গনিমত মনে করো, তোমার প্রিয় হায়াতটিকে সংরক্ষণ করো। জেনে রাখো, তোমার হায়াত সীমিত। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসগুলো পরিমিত। প্রতিটি শ্বাসেই কিন্তু তোমার জীবনের একটা অংশ হ্রাস পায়। পুরো জীবনটাই খাটো। যা বাকি আছে সেটা অত্যন্ত সামান্য। তোমার জীবনের প্রতিটি অংশই একটি মহামূল্যবান জওহর, যার কোনো তুলনা নেই, যার কোনো বিকল্প নেই। কারণ, এই সমান্য জীবন দ্বারাই কিন্তু অর্জিত হবে চিরস্থায়ী জীবন শান্তির বা যন্ত্রণাদায়ক কষ্টের।

এই জীবনটাকে যদি চিরস্থায়ী জীবনের সাথে তুলনা করো তাহলে জানতে পারবে যে, প্রতিটি শ্বাস চিরস্থায়ী আরামের যুগের হাজার বছরের চেয়েও অধিক সময়ের সমমানের হবে বা তার উল্টা হবে। (অর্থাৎ, কষ্টের হাজার বছরের চেয়েও অধিক সময়ের সমমানের হবে) আর যা এরূপ হয় তা হয় অমূল্য সম্পদ। কাজেই তুমি তোমার জীবনের দামি মুক্তাগুলোকে অলসতা করে নষ্ট করো না। এবং বিনামূল্যে ধ্বংস করো না।

চেষ্টা করো যেন তোমার প্রতিটি শ্বাস কোনো নেক কাজ বা সওয়াবের কাজে ব্যয় হয়। তোমার কাছে যদি দুনিয়ার কোনো মণি-মুক্তা থাকত, আর সেটা হারিয়ে যেত, তাহলে তুমি অবশ্যই প্রচণ্ডভাবে ব্যথিত হতে। মুক্তা কেন, বরং যদি তোমার একটি সামান্য স্বর্ণমুদ্রাও হারিয়ে যেত, তাহলে সেটার জন্যও তুমি দুঃখিত হতে। তাহলে তুমি তোমার মুহূর্তগুলো ও সময়গুলো কী করে অবহেলায় নষ্ট করো? কেন তুমি অযথা নষ্ট হয়ে যাওয়া জীবনের জন্য ব্যথিত হও না?'

লেখক বলেন, সম্মানিত পাঠক! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ও আমাকে সময়ের হেফাজত ও সময়কে নেক আমল ও উপকারী ইলম দ্বারা পূর্ণ করার তাওফিক দান করুন! আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন! যারা জীবন ও সময়ের মূল্য বুঝতে পেরেছে, যারা নিজেদেরকে, স্বজাতিকে ও স্বদেশকে ধোঁকা দেয় না এবং এরাই প্রকৃত জ্ঞানী।

হজরত ইবনে মাসউদ রাদি.-এর লজ্জাবোধ

হজরত ইবনে মাসউদ রাদি.—যিনি একজন মহান সাহাবী—বলেন, আমি কোনো জিনিসের জন্য এতটা লজ্জিত হই না, যতটা লজ্জিত হই ওই দিনের জন্য যার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়, আর আমার বয়স কমে যায়, অথচ আমার আমলের মধ্যে কোনো বৃদ্ধি হয় না।

ইমাম শাফেয়ি রহ. রাতকে তিন ভাগ করে নিতেন

ইমাম শাফেয়ি রহ. (জন্ম : ১৫০ হি., মৃত্যু : ২০ হি.)-এর শিষ্য রবি ইবনে সুলায়মান মুরাদি রহ. থেকে কাজি ইয়াজ রহ. বর্ণনা করে বলেন, শাফেয়ি রহ. রাতটাকে তিনভাগে ভাগ করে নিতেন। প্রথম ভাগে তিনি লিখতেন। দ্বিতীয় ভাগে নামাজ পড়তেন। তৃতীয় ভাগে ঘুমাতেন।

ইবনুল বাগদাদি কেবল অপারোগ হয়েই ঘুমাতেন

খতিব রহ. রচিত 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ বুজুর্গ হোসাইন ইবনে আহমদ ইবনে জাফর আবু আব্দিল্লাহ রহ. (মৃত্যু : ৪০৪ হি.)—যিনি ইবনুল বাগদাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন—এর জীবনী আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি সত্যবাদী, দীনদার, আবেদ, জাহেদ, পরহেজগার ছিলেন। কোনো এক শায়েখকে আমি বলতে শুনেছি, আবু আব্দিল্লাহ ইবনুল বাগদাদি সদা আমাদের কাছে আসতেন এমতাবস্থায় যে, তার মাথা ফাটা ও কপাল আহত থাকত। একবার তাকে বলা হলো, এমনটা কীভাবে হয়? জবাবে তিনি বললেন, তিনি অপারগ না হয়ে ঘুমান না। তার সামনে সদা কালির দোয়াত বা থালা বা অন্য কোনো জিনিস রাখা থাকে। যখন ঘুম চাপে তখন সেই বস্তুটির ওপর পড়ে যান। ফলে সেটা তার মাথা ও কপালকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

ইয়াকুব নাজিরামি রহ. হাঁটতে হাঁটতে কিতাব পড়তেন

কিফতি রহ. রচিত 'ইম্বাহুর রুয়াত আলা আম্বাইন নুহাত' নামক কিতাবে মুহাম্মদ সাইদি ইবনে বারাকাত নাহভি বসরি মিসরি রহ. (জন্ম : ৪২০ হি., মৃত : ৫২০ হি.; ১০০ বছর বয়সে)-এর জীবনী আলোচনায় আছে, 'তিনি বলেন, আমি শৈশবে আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে খুররাযায নাজিরামিকে কারাফার পথে হাঁটতে দেখেছি। তার গায়ের রং ছিল গোধূমবর্ণের, দাড়ি ছিল অনেক বড়, পাগড়িটা ছিল গোল। তার হাতে ছিল একটি কিতাব, হাঁটতে হাঁটতে তিনি তা অধ্যয়ন করছিলেন।

এখানে আনুষঙ্গিকরূপে ফখরুদ্দিন রাযির আরেকটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি, যা তার চরম ইলমপ্রীতির সাক্ষ্য বহন করে

ইয়াকুত হামাভি তার 'মুজামুল উবাদা' নামক কিতাবে বংশবিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট সাহিত্যিক শরিফ মারওয়াযি আলাভি রহ. (জন্ম : ৫৭২ হি., মৃত্যু : ৬১২ হি.

পর)-এর জীবনীতে লিখেছেন, আল্লামা ইয়াকুত হামাভি তার সাথে ৬১৪ হিজরিতে মারু এলাকায় সাক্ষাৎ করেন এবং আখলাক ও ইলমের ওপর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, তিনি সদাচার, নম্রতা, ভদ্রতা, লাজুকতা, হাসিমাখা চেহারা ও বহিরাগত শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ক ছিলেন। যা আমরা অন্য অনেকের মাঝে বিচ্ছিন্নরূপে দেখতে পাই। এর পাশাপাশি তিনি বংশজ্ঞান, নাহু, অভিধান, কবিতা, উসুল ও জোতিষ্কবিদ্যার সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিনয়ী ও সদাচারী ছিলেন।

তিনি আমাকে বলেছেন, একদা ফখরুদ্দিন রাযি রহ. মারু অঞ্চলে এলেন। তিনি মর্যাদার উচ্চতা, বিশাল ব্যক্তিত্ব ও শ্রদ্ধাজনিত ভিতির কারণে তার কথার কেউ প্রতিবাদ করতে পারত না। তার মহত্ত্বের কারণে তার সামনে শ্বাস ফেলারও সাহস পেত না। যেমনটা সর্বজনবিদিত।

আমি তার সাথে দেখা করলাম। তার কাছে পড়ার জন্য বারবার যাতায়াত করলাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমাকে তালেবে ইলমদের বংশলতিকা সম্পর্কে একটি ছোট্ট পুস্তিকা লিখে দাও! আমি তা পড়ব। এ বিষয়ে অজ্ঞ থেকে আমি মরতে চাই না। আমি তাকে বললাম, শাজারাহ আকারে লেখব না বিক্ষিপ্তভাবে? তিনি বললেন, শাজারাহরূপে লিখলে তা সহজে মুখস্থ করা যায় না। আর আমি তা মুখস্থ করতে চাই। আমি বললাম, ঠিক আছে, তেমনটাই হবে।

আমি তার কাছ থেকে উঠে গেলাম। এবং ফখরুদ্দিন রাযির প্রতি ইঙ্গিত করে 'ফখরি' নামে কিতাবটি লিখলাম। এরপর আমি কিতাবটি নিয়ে তার কাছে এলাম। তিনি জানতে পেরে তার পাঠদানের সময়ের আসনটি ছেড়ে নিচে নেমে এলেন। চাটাইয়ে বসলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি ওই আসনটিতে বসো! আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম। কিন্তু তিনি রাগের স্বরে আমাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, আমি যেখানে বসতে বলেছি সেখানে বসো! আমি ভয়ে অস্থির হয়ে গেলাম। কিন্তু করার কিছু ছিল না। তাই নিরুপায় হয়ে আমি তার আদেশমতো বসলাম।

এরপর তিনি আমার সামনে বসে উক্ত কিতাবটি আমাকে পড়ে শোনালেন। যেখানে জটিলতা অনুভব করতেন আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। এভাবে তিনি কিতাবটি শেষ করলেন। অতঃপর বললেন, এখন যেখানে মনে চায় বসো। এই

বিষয়ে তুমি আমার উস্তাদ। আমি তোমার কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছি। আমি তোমার ছাত্র হলাম। আর ছাত্র উস্তাদের সামনে বসবে—এটাই আদব।

আমি আমার স্থান থেকে উঠে গেলাম। তিনি তার স্থানে এসে বসলেন। এরপর আমি আগের স্থানে বসে তার কাছে পড়তে লাগলাম। আমি শপথ করে বলতে পারি, এটা নিঃসন্দেহে একটা সুন্দর শিক্ষণীয় আদব। বিশেষ করে ওই মহান মর্যাদাবান মনীষীর পক্ষ থেকে।

পাঠক! লক্ষ করুন! কীভাবে বিনয় প্রদর্শন করলেন, স্ব-যুগের এই অনন্যসাধারণ ইমাম! নিজ শিষ্যের কাছে আবেদন করলেন তাকে বংশবিদ্যা শিখাতে। আপন শিষ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করলেন না। তাকে উস্তাদের স্থানে বসালেন। তিনি ছাত্রের স্থানে বসলেন। এটাই ছিল তার বিনয় ও মহত্ত্বের প্রতীক, যার দ্বারা ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি রহ.-এর মর্যাদা বেড়ে গগণচুম্বী হয়ে গেল। এতে তার মর্যাদার হানি ঘটেনি। লক্ষ করুন! ওই ধরনের আলেমদের হৃদয়ে ইলম কত প্রিয় ছিল! তাদের মনে ইলমের মর্যাদা কত উঁচু ছিল! তাদের দৃষ্টিতে ইলম কত প্রিয় ছিল! তাদের দৃষ্টিতে ইলম কত উচ্চাঙ্গের বিষয় ছিল! উত্তরসূরিদের এই মহান পূর্বসূরিদের অনুসরণ কত প্রয়োজন! তারা ইলমের জন্য বিনয়ী হতে দ্বিধাবোধ করেন না। এমনকি তাদের ছাত্রদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। তাতে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করেন না। কেননা ইলম তাদের হৃদয়ে সকল মান-মর্যাদার উর্ধ্বের বিষয় ছিল, সবকিছু থেকে অধিক দামি ছিল।

ইবনে সাইদ আন্দালুসি রহ. মনে করেন, ইলম অর্জনের মধ্যেই তার শান্তি বিরাজমান

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মাক্কারি রহ. স্বরচিত 'নাফহুত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব' গ্রন্থে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আদিব আবুল হাসান আলি ইবনে মুসা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে সাইদ আন্দালুসি রহ. হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি স্বরচিত 'আল-মুগরিব ফি হুলা আহলিল মাগরিব' গ্রন্থে।

[গ্রন্থটি লেখায় ইবনে সাইদ পরিবারের পাঁচজন মনীষী অংশগ্রহণ করেছেন। আবুল হাসানের দাদা, চাচা, পিতা, আরও একজন; সবশেষে তিনি নিজে কিতাবটি সমাপ্ত করেছেন] তার পিতা বিদগ্ধ আলেম ইতিহাসবিদ আদিব আবু ইমরান মুসা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাইদ আন্দালুসি রহ. (জন্ম : ৫৭৩ হি., মৃত্যু

: ৬৪০ হি.)-এর জীবনী লেখার সময় বলেছেন, যদি তিনি আমার পিতা না হতেন তাহলে তার বিস্তর আলোচনা করতাম। তার বিবরণ পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরতাম। তবে যতটুকু তার জীবনীতে লিখেছি তাকে জানার জন্য ততটুকুই যথেষ্ট।

তিনি বলেছেন, 'তার বিস্ময়কর ব্যাপার যা আমি দেখেছি তা হলো, তিনি ৬৭ বছর বেঁচে ছিলেন। তাকে কোনোদিন দেখিনি কিতাব অধ্যয়ন বা লেখা থেকে বিরত থাকতে। এমনকি ঈদের দিনেও না। আমি একবার ঈদের দিন তার কাছে গেলাম। তখন তিনি অনেক পরিশ্রম করে লিখে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে বললাম, আব্বাজান! আজকেও একটু আরাম করবেন না? তিনি রাগের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তুমি কোনোদিন সফল হবে না। তুমি কি মনে করো অন্য কিছুতে আরাম রয়েছে? আল্লাহর শপথ! অন্য কিছুতে এত আরাম আছে বলে আমি মনে করি না। আমি আশা করি আল্লাহ আমার বয়স দ্বিগুণ করে দেবেন, যেন আমি 'আল-মুগরিব' কিতাবটি মনমতো সমাপ্ত করতে পারি।

আবুল হাসান রহ. বলেন, তার সেই উক্তি আমাকে অনেক নাড়া দিলো। ফলে আমি তার মতো হয়ে গেলাম। পড়াশোনা ও লেখালিখিতে যে স্বাদ আমি অনুভব করি এরূপ আর অন্য কোনো নিয়ামতে অনুভব করি না। যদি এমনটা না হতো তাহলে 'আল-মুগরিব' কিতাবটি এ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারত না, যা আপনি দেখছেন।

তিনি শহরে শহরে ঘুরে বেড়ানো, জ্ঞানীগুণীদের সাথে সাক্ষাৎ করা, বিভিন্ন বিষয় দেখে ও শুনে উপকৃত হওয়ার প্রতি সর্বাধিক আগ্রহীদের অন্যতম ছিলেন।

এমন মনীষীদের ব্যাপরেই নিম্নে বর্ণিত কবিতাগুলো :

ওহে! আপন জীবন ধ্বংসকারী শরাব ও জুলুম নির্যাতনে
ওহে অন্ধকারে অপেক্ষমাণ, উজ্জ্বল নক্ষত্রের নির্বাপণে
সে কাঁদে এমন বন্ধুর জন্যে যে তার থেকে মুখ টানে
অথবা এমন ব্যক্তির জন্যে যে দৌড়ে চলে যায় সামনে
সে এমন ডালের মতো যার নামকরণ হয়েছে ফুলের নামে
ওহে স্বাদের বিলাসী, যেগুলো মিটে যায় এই জীবনে
যখন ব্যর্থ হয় সে গর্ভময়ী ও ভালো অভ্যাস ধারণে

ওহে! তিরস্কারকারী আমার লেখালিখি ও সংকলনে
যে হতভম্ব হয় আমার ফিকির ও ধৈর্য অবলোকনে
বলে সে, কী হলো? তোমার বয়স খতম কাগজ আর কলমে
যা তৈরি হয়েছে ডাল-পালা আর ছাইয়ের মিশ্রণে
তুমি ক্লান্ত হয়ে ব্যস্ত থাকো রাত্রি জাগরণে
তোমাকে দেখানো হয়নি সদা অস্থির আচরণে
তুমি ছোটো করো এবং জিজ্ঞেস করো সংবাদ আহরণে
আমি জানি কে অগ্রিম আমার মনোবলের অবাধ্যকরণে
তুমি কান পাতো ওই ব্যক্তির প্রশংসা ও গুণকীর্তনে
যিনি মাটি হওয়ার পর, যার আলোচনা হয় সুরা পাঠের ধরনে
যারা ছিল দুনিয়াতে জমিনওয়ালার সৌন্দর্য
মৃত্যুর পর তারা কিতাব ও আদর্শের কারুকার্য।

ইবনে মালেক রহ. সদা নামাজ পড়তেন বা তিলাওয়াত করতেন বা লিখতেন বা পড়তেন—অন্য কিছু করতেন না

বড়ো বড়ো ইমাম যারা ঘণ্টা ও মুহূর্তগুলোর হেফাজত করেছেন; এমনকি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও শেষ বিদায়ের সময়ও, এবং মৃত্যুর সামান্য পূর্বেও ইলম অর্জন করেছেন, তাদের অন্যতম আলফিয়া ইত্যাদি কিতাবের লেখক ইমাম ইবনে মালেক নাহবি রহ.। যার নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, (জন্ম : ৬০০ হি., মৃত্যু: ৬৭২ হি.) মাক্কারি রহ. রচিত 'নাফহুত তিব' নামক কিতাবে তার জীবনী আলোচনায় আছে, তিনি ছিলেন অধিক অধ্যয়নকারী, দ্রুত পুনঃপাঠকারী। নিজ মুখস্থবিদ্যা পুনরায় কিতাবের স্ব-স্থানে না দেখে তিনি লিখতেন না। এটাই ছিল নির্ভরযোগ্য মাশায়েখ ও উলামাদের অবস্থা। তাকে শুধু নামাজ বা তিলাওয়াত বা লেখালিখি বা পড়তে দেখা যেত।

বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি দামেশকে তার ছাত্রদের নিয়ে বিনোদনে বের হলেন। গন্তব্যে পৌঁছার পর তারা সামান্য সময়ের জন্য তার ব্যাপারে একটু উদাসীন হলেন। এরপর তালাশ করে আর তাকে পাচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ পর তাকে খুঁজে পেলেন তো দেখলেন তিনি কয়েকটি কাগজে উপুড় হয়ে আছেন।

ইবনে মালেক রহ. মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কবিতার আটটি চরণ শুনে শুনে মুখস্থ করেছেন

তার ইলমচর্চার এর চেয়েও অধিক বিস্ময়কর বিষয় হলো যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি মৃত্যুর দিন কবিতার কয়েকটি চরণ মুখস্থ করেছেন। যার পরিমাণ কেউ কেউ আটটি বলেছেন। তার ছেলে তাকে সেগুলো শিখিয়ে দিয়েছিল। এ ঘটনাটি সেই বিখ্যাত উক্তিটির সত্যতা প্রমাণ করে : 'পরিশ্রম অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়'। আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই উচ্চাঙ্গের মনোবলের জন্য উত্তম বদলা দান করুন। তিনি ৬৭২ হি. সনে দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। এবং কাসিউন পর্বতের পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়। তার কবরটি এখনো সুপরিচিত।

ইমাম নববি রহ. দু-বছর পর্যন্ত বিছানায় পিঠ লাগাননি

হাফেজ যাহাবি রহ. 'তাযকিরাতুল হুজফায' নামক গ্রন্থে ও ইবনে কাজি শুহবাহ 'তাবাকাতুশ শাফেইয়্যা' গ্রন্থে ইমাম নববি ইয়াহইয়া ইবনে শরফ হাউরানি রহ. সম্পর্কে বলেছেন, তিনি হলেন ওলিকুল শিরোমণি, অনন্য হাফেজে হাদিস ও শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দিন আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররি হিযামি হাউরানি শাফেয়ি। যিনি বহু উপকারী গ্রন্থের রচয়িতা।

তিনি ৬৩১ হি. সনে হাউরানের অন্তর্গত নাওয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৪৯ হি. সনে দামেশকে আসেন। সেখানে রাওয়াহিয়া মাদরাসায় অবস্থান করেন। তিনি মাদরাসার রুটি খেতেন। তিনি বলেছেন, আমি দু-বছর যাবৎ মাটিতে পিঠ লাগাইনি। তিনি মাত্র সাড়ে চার মাসে 'আত-তাম্বিহ' কিতাবটি মুখস্থ করেন। বাকি বছরে শায়খ কামাল ইসহাক ইবনে আহমদের নিকট 'আল-মুহাযযাব' কিতাবটির এক-চতুর্থাংশ মুখস্থ করে পড়েন।

ইমাম নববি রহ. দৈনিক বারোটি পাঠ গ্রহণ করতেন পূর্ণ আয়াত ও টীকা লেখাসহ

তার ছাত্র আবুল হাসান ইবনুল আত্তার রহ. বলেছেন, শায়খ মুহিউদ্দিন রহ. তাকে বলেছেন, তিনি তার মাশায়েখদের নিকট ব্যাখ্যা ও সংশোধনসহ দৈনিক বারোটি সবক পড়তেন। ফেকাহ-সংক্রান্ত 'ওয়াসিত' কিতাবে দুইটি সবক, এ সংক্রান্তই 'মুহাযযাব' কিতাবে একটি সবক, হাদিস-সংক্রান্ত 'আল-জামউ

বাইনাস সহিহাইন' কিতাবে একটি সবক, সহিহ মুসলিম শরিফে একটি সবক, নাহু-সংক্রান্ত ইবনে জিন্নির লেখা 'আল-লুমা' কিতাবে একটি সবক, অভিধান-সংক্রান্ত ইবনুস সিক্কিতের লেখা 'ইসলাহুল মানতিক' কিতাবে একটি সবক, সরফ বিষয়ে একটি সবক, উসুলে ফেকাহ সম্পর্কে একটি সবক, কখনো আবু ইসহাক লিখিত 'আল-লুমা' কিতাবে আবার কখনো ফখরুদ্দিন রাযি লিখিত 'আল-মুন্তাখাব' কিতাবে। আসমাউর রিজাল বিষয়ে একটি সবক, উসুলে দীন সম্পর্কে একটি সবক। নববি বলেন, আমি উক্ত পাঠ-সংক্রান্ত সব বিষয় লিখে রাখতাম। যেমন : জটিল বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা, ইবারত সুস্পষ্টকরণ, শব্দের সঠিক উচ্চারণ লিপিবদ্ধকরণ। আল্লাহ তায়ালা আমার সময়ে বরকত দান করেছেন।

ইমাম নববি রহ. রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার খেতেন

আবু হাসান ইবনুল আত্তাব রহ. বলেন, আমার শায়খ আমাকে বলেছেন, তিনি কোনো মুহূর্ত নষ্ট করতেন না। রাতেও না, দিনেও না। তিনি সদা ইলম চর্চায় ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি রাস্তায় পথচলার সময়ও তাকরার ও মুতালাআ করতেন। পুরো ছটি বছর তিনি এভাবে কাটিয়ে দেন। এরপর তিনি লেখালিখি, অধ্যাপনা, উপদেশ প্রদান ও সত্যকথন শুরু করেন। তিনি দিন-রাত মিলিয়ে মাত্র একবার খেতেন, এশার নামাজের পর। আর সেহেরির সময় একবার পানি পান করতেন। তিনি ফলফলাদি ও ক্ষিরা খেতেন না। তিনি বলতেন, আমার আশঙ্কা হয় এগুলো আমার শরীরকে আর্দ্র করে দেবে এবং আমার ঘুম বৃদ্ধি করবে। তিনি সারা জীবন বিয়ে করেননি। একদা শায়খ বুরহানুদ্দিন এস্কেন্দারানি তার কাছে ইফতার করার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। তিনি বললেন, খাবার এখানে নিয়ে আসুন! একসঙ্গে খাব। এরপর তিনি খেয়েছেন। খাবার ছিল দু-পদের।

খাবার, পোশাক ও জীবনযাপনে ইমাম নববি রহ.-এর অনাড়ম্বরতা ও অমসৃণতা

পাঠদান, রচনা, ইলম চর্চা, ইবাদত, জিকির ও খোরপোষে কঠিন জীবনযাপনে ধৈর্যধারণকে তিনি জীবনের অভ্যাস হিসেবে চরমভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তার পোশাক ছিল সাদাসিধে কাপড়। তার পাগড়ি ছিল ছোটো ও চামড়ার।

ইমাম নববি রহ. সামান্য সময় ঘুমাতেন; যখন ঘুম প্রবল আকার ধারণ করত

হাফেজ সুয়ুতি রহ. রচিত 'আল-মানহালুস সাভি ফি তারজাতিল ইমাম নাববি' কিতাবে আছে, কামাল উদফাভি রহ. 'আল-বদরুস সাফির' নামক কিতাবে বলেছেন, ইমাম নববির ছাত্র প্রধান বিচারক বদরুদ্দিন রহ. আমাকে বলেছেন, তিনি তার ঘুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে নববি রহ. বলেছেন, যখন ঘুম প্রবল হয় তখন সামান্য সময়ের জন্য কিতাবাদিতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে যাই।

শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে হামদান আওজায়ি 'অত্তাওয়াসসুত ওয়াল ফাতহু' কিতাবে বলেছেন, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, ইমাম নববি নিরন্তর লিখে যেতেন। যখন ক্লান্ত হয়ে যেতেন তখন কলমটি রেখে দিয়ে আরাম করতেন আর নিম্নোক্ত চরনটি আবৃত্তি করতেন—

যদি বয়ে যায় এই নয়নবারি সু'দা ব্যতীত অন্যের তরে
ধরা হবে সেটা এমন অশ্রু যা বিনষ্ট অকাতরে।

ইমাম নববি রহ. 'আল-ওয়াসিত' কিতাবটি চারশ বার পাঠ করেছেন

'আল-মানহালুস সাভি' কিতাবে আরও আছে, উদফাভি রহ. বলেছেন, একদা 'আল-ওয়াসিত' কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদানে তার সঙ্গে কেউ বিতর্কে লিপ্ত হলো। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে তর্ক করো, অথচ আমি এ কিতাবটি চারশ বার পাঠ করেছি?

তিনি ৬৭৬ হি. সনে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স হয়েছিল সাকুল্যে ৪৫ বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিশাল বিশাল অনেক কিতাব লিখে গেছেন। তার জীবনের দিনগুলোতে এগুলোকে ভাগ করলে প্রতিদিন চারটি করে খাতা পড়ে।

ডাক্তার ইবনুন নফিস রহ. চিকিৎসাবিজ্ঞান, ফেকাহ ও সময় সংরক্ষণে ঈর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন

যে সমস্ত বড়ো বড়ো মনীষী ও অনন্য শ্রেষ্ঠ ডাক্তারগণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হেফাজত করেছেন, কল্পনা-ভাবনাগুলো লিখে রেখেছেন বিস্ময়কর মুহূর্তগুলোতে,

তাদের অন্যতম হলেন স্ব-যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনুল নাফিস দিমাশকি রহ.; অতঃপর মিশরি শাফেয়ি।

সুবকি রহ. রচিত 'তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাতিল কুবরা' এবং আল্লামা খাওয়ানেসারি রচিত 'রওজাতুল জান্নাত' গ্রন্থে সালাহুদ্দিন সাফাদি রহ.-এর 'আল-ওয়াফি বিল ওফায়াত' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ আছে, যা থেকে আমি নিম্নোক্ত বিবরণটি কুড়িয়ে এনেছি :

তিনি হলেন ইমাম, মহাজ্ঞানী, ডাক্তার, আল্লামা আলাউদ্দিন ইবনুন নাফিস আলি ইবনে আবু হাজম কারশি, (মাওয়ারাউন্নাহার এলাকার কারশ নামক শহরের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে) জন্ম : ৬১০ হি. সনে দামেশকে, মৃত্যু : ৬৮৭ হি. সনে কায়রোতে।

তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের অনন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন। চিকিৎসা-সংক্রান্ত তার লেখা উচ্চাঙ্গের অনেক কিতাব রয়েছে। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে 'আশশামেল' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। এ কিতাবটির সূচিপত্র দ্বারা প্রতীয়মান হয় এটা তিনশ খণ্ডে সমাপ্ত ছিল। তার কোনো একজন শিষ্য এটা উল্লেখ করেছেন। আশিটি খণ্ড তিনি প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া 'আল-মুহাজজাব' নামে সুরমা সম্পর্কে একটি কিতাব লিখেছেন। এবং ইবনে সিনা লিখিত 'আল-কানুন'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যা কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত।

তিনি মানতিক সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন। এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত কিতাবও লিখেছেন। ইবনে সিনার 'আল-হিদায়া' নামক কিতাবটিরও ব্যাখ্যা করেছেন। তা ছাড়া ফিকহ, উসুলে ফিকহ, সাহিত্য, হাদিস ও ইলমুল বয়ান ইত্যাদি বিষয়েও কিতাব লিখেছেন। আবু ইসহাক সিরাজি রহ.-এর লেখা শাফেয়ি ফিকাহর কিতাব 'আত-তাম্বিহ' কিতাবটির শুরু থেকে সাহু সিজদার আলোচনা পর্যন্ত খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কায়রোর মাসরুরিয়া মাদরাসায় ফিকাহ পাঠদানের দায়িত্বও পালন করেছেন।

মোটকথা, তিনি একাধিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আর চিকিৎসাবিদ্যায় তো সারা পৃথিবীতে তার কোনো জুড়ি ছিল না। ইবনে সিনার পর তার মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানী আর আসেনি। লোকেরা বলে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনি ইবনে সিনাকেও ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন। তার কিতাবগুলো তিনি মুখস্থ লেখাতেন। ইমাম বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম রশিদি বলেছেন, আলা ইবনুল নফিস রহ. যখন কিতাব লেখার ইচ্ছা করতেন, তখন তার সামনে কলমগুলো তৈরি করে রাখা হতো।

তিনি দেওয়ালের দিকে ফিরে বসে মুখস্থ লিখতে শুরু করতেন। বন্যার স্রোতের মতো লিখে যেতেন। কলম ক্লান্ত ও ভোঁতা হয়ে গেলে সেটা ফেলে দিয়ে অন্য আরেকটি হাতে নিতেন। যেন কলম কাটতে গিয়ে তার সময় নষ্ট না হয়। কিতাব লেখার সময় তিনি কোনো কিতাব দেখতেন না, সরাসরি হৃদয় থেকে লিখতেন।

ইবনুন নফিস রহ. ফজর পর্যন্ত সারা রাত ইবনে ওয়াসেল রহ.-এর সাথে ইলমি আলোচনা করেছেন

তার ছাত্র কায়রোর ডাক্তার সাদিদ দিময়াতি রহ. বলেন, একবার কোনো এক রাতে ইবনুন নফিস ও কাজি জামালুদ্দিন ইবনে ওয়াসেল একত্রিত হলেন। আমি তাদের কাছে ঘুমিয়ে ছিলাম। এশার নামাজের পর তারা আলোচনা শুরু করেন। এক বিদ্যা থেকে আরেক বিদ্যার দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছিলেন। শায়খ আলাউদ্দিন ইবনুন নফিস শান্ত মনে দক্ষতার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কাজি জামালুদ্দিন মাঝেমধ্যেই উত্তেজিত হয়ে যেতেন এবং তার গলার স্বর উঁচু হয়ে যেত। তার চক্ষুদ্বয় রক্তিম হয়ে যেত। তার গলার রগসমূহ স্ফীত হয়ে যেত। ভোরের আলো ফুঠে উঠা পর্যন্ত তারা এভাবেই আলোচনা চালিয়ে গেলেন।

আলোচনা শেষ হবার পর কাজি জামালুদ্দিন বললেন, হে শায়খ আলাউদ্দিন! আমাদের কাছে রয়েছে অনেক বিষয়, অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও অনেক মূলনীতি। কিন্তু আপনি! আপনার কাছে রয়েছে বহু বিজ্ঞানের অসংখ্য ভান্ডার।

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. অসুস্থতা ও সফরের সময়ও অধ্যয়ন ও ইলম চর্চা করতেন

লেখক বলেন, তাঁর এই পুস্তকাঢ্যতার কারণ হলো, তিনি সফর ও হজর, সুস্থতা ও অসুস্থতা সর্বাবস্থায় অধ্যয়ন ও ইলম চর্চা অব্যাহত রাখতেন। তার শিষ্য ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. স্বরচিত 'রওজাতুল মুহিব্বিন' নামক কিতাবে বলেন, আমাদের শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. আমাকে বলেছেন, আমি একবার রোগাক্রান্ত হলাম। ডাক্তার আমাকে বলল, আপনার অধ্যয়ন ও ইলম চর্চা অসুস্থতা বৃদ্ধি করবে। আমি তাকে বললাম, আমি এটা সহ্য করতে পারব না।

আপনার জ্ঞানের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, মন যখন আনন্দোৎফুল্ল থাকে মানুষের প্রকৃতি তখন শক্তিশালী হয় এবং রোগবালাইকে তাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি কি এমন নয়? ডাক্তার বলল, জি হ্যাঁ। তখন আমি তাকে বললাম, আমার মন ইলম চর্চায় আনন্দিত হয়, তাতে আমার প্রকৃতি শক্তিশালী হয়। ফলে আমি তাতে আরাম বোধ করি। কাজেই এটা অসুস্থতা বৃদ্ধি করবে কেন? ডাক্তার বলল, এটা আমাদের চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বয়োজ্যেষ্ঠ হাফেজে হাদিস ইবনুশ শিহনাহ হাজ্জার রহ. একশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর একটু আগেও ছাত্ররা তার কাছে পড়েছে

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 'আদদুরারুল কামিনাহ' গ্রন্থে বলেছেন, হাফেজ শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবু তালেব—যিনি ইবনুশ শিহনাহ হাজ্জার দামেশকি সালিহি হানাফি নামে বিখ্যাত; ৬২২ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন—তিনি একশরও বেশি বয়স প্রাপ্ত হন। ফলে নাতিকে দাদার সাথে মিলিয়ে দেন। (অর্থাৎ, দাদা ও নাতি উভয়ই তার কাছে পড়ার সুযোগ পায়) তিনি দামেশক ও প্রভৃতি শহরে সত্তরেরও অধিকবার সহিহ বুখারি পাঠদান করেন।

হাফেজে হাদিসগণ তাকে নির্বাচন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন শহর থেকে এসে তারা তার কাছে ভিড় করে। তিনি একশ বছর বয়সেও রমজানের রোজা রেখেছেন। এবং শাওয়ালের ছয় রোজা রেখেছেন। তার মৃত্যুর একদিন আগে মুহিব্বুদ্দিন ইবনে মুহিব্ব রহ. তার কাছে সহিহ বুখারি শরিফ পড়তে শুরু করেন। তার মৃত্যুর দিন দ্বিতীয় বৈঠকে চাশতের সময় পর্যন্ত পড়েছেন। ওই দিনেই জোহরের একটু আগে তিনি ৭৩০ হি. সনে মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতানুল উলামার পৌত্রী মৃত্যুর দিনও হাদিস পড়িয়েছেন

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 'আদদুরারুল কামিনাহ' গ্রন্থে বয়োজ্যেষ্ঠা আলেমা মুহাদ্দিসা জয়নব বিনতে ইয়াহইয়া সুলামিয়্যাহ, (জন্ম : ৬৪৮ হি., মৃত্যু : ৭৩৫ হি.)-এর আলোচনায় নিম্নোক্ত বক্তব্য তুলে ধরেছেন :

সুলতানুল উলামা ইজজুদ্দিন ইবনে আব্দুস সালাম সুলামির ছেলে ইয়াহইয়া তনয়া জয়নব ৬৪৮ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। সিলাফির পৌত্র আব্দুর রহমান ইবনে

মক্কি এস্কান্দারানি (মৃত্যু : ৬৬১ হি.) তাকে ৬৫০ হি. সনে বর্ণনার ইজাজত প্রদান করেন। তিনি পাঁচ বছর বয়সে কারাফায় উসমান ইবনে খতিবের নিকট উপস্থিত হন। তার সাথে আরও উপস্থিত হন উমর ইবনে আউয়াহ, ইবরাহিম ইবনে খলিল প্রমুখ আলেমগণ। তিনি তাবরানির 'মুজামে সগির' কিতাবটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এককভাবে বর্ণনা করেন।

জাহাবি রহ. বলেছেন, তিনি একজন কল্যাণকামিণী, আবেদা ও রেওয়ায়েতে আগ্রহী নারী ছিলেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর দিনেও তার কাছে কয়েকটি জুজ পঠিত হয়।

শামসুদ্দিন আসবাহানি কম খেতেন, যেন বাথরুমে যাতায়াতের কারণে সময় নষ্ট না হয়

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. লিখিত 'আদদুরারুল কামিনাহ' গ্রন্থে ও শাওকানি লিখিত রহ. 'আল-বদরুত তালে' গ্রন্থে বিখ্যাত উসুলবিদ, ফকিহ, মুফাসসির ইমাম আল্লাম শামসুদ্দিন আবুস সানা আসবাহানি মাহমুদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ শাফেয়ি রহ.-এর জীবনী আলোচনায় নিম্নোক্ত বিবরণ রয়েছে : তিনি মাতৃভূমিতে ইলম অর্জন শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি দক্ষতা অর্জন করেন ও বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রসর হন। ৭২৫ হি. সনের সফর মাসে কুদস পরিদর্শন করার পর তিনি দামেশকে আগমন করেন। তার গুণাবলি দামেশকবাসীকে চরমভাবে মুগ্ধ করে। শায়খ তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া রহ. তার কথা শুনে তাকে অত্যন্ত সম্মান করেন। তিনি একদা বলেন, চুপ করো, আমাদেরকে এই মহান জ্ঞানী মনীষীর বক্তব্য শুনতে দাও! তার মতো আলেম ইতিপূর্বে আমাদের এই এলাকায় আসেনি। এরপর তিনি কায়রোতে চলে যান। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইলমের প্রতি তার আগ্রহ ও সময় ব্যয়ে তার কৃপণতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তার একজন ছাত্র বর্ণনা করতেন যে, তিনি খুব কম খেতেন, যেন পানি পানের প্রয়োজন না হয়। কারণ, তাহলে বাথরুমে বেশি যেতে হবে আর তাতে তার সময় নষ্ট হবে। লেখক বলেন, পাঠক! দেখুন, এই মহান ইমামের নিকট সময়ের মূল্য কত বেশি ছিল! আর সময়ের মূল্য বেশি হওয়ার কারণ হলো ইলমের মূল্যায়ন। কি আশ্চর্য! তিনি কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন!

ইবনে রজব হাম্বলি রহ.-এর ইলম চর্চায় চরম তন্ময়তা

'জাইলু ইউসুফ ইবনে আব্দুল হাদি হাম্বলি আলা তাবাকাতি ইবনে রজব' নামক গ্রন্থে হাফেজ ইবনে রজব (আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রজব) বাগদাদি অতঃপর দামেশকি হাম্বলি রহ.-এর জীবনী আলোচনায় আছে, তিনি দুনিয়ার কোনো কিছুই জানতেন না। তিনি নেতৃত্বমুক্ত ছিলেন। ইলম চর্চা ছাড়া তার কোনো ব্যস্ততা ছিল না। আমাদের শায়খ শিহাবুদ্দিন ইবনে জাইদ আমাদেরকে বলেছেন, একদা তার স্ত্রী গোসলখানায় গোসল করে সেজেগুজে তার কাছে এলো। কিন্তু তিনি তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। স্ত্রী তখন বলল, তোমাদের কেউ কেবল এমন লোক চায় যে তাকে কুকুরের মতো ছেড়ে দেয়। এ কথা বলে স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়।

লেখক বলেন, আমার মনে হয় তখন তিনি কেবল ইলম, গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের মজা উপভোগ করছিলেন। তাই অন্য কোনো উপভোগ্য জিনিসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। সাজগোজ ও পরিচ্ছন্নতার সুরভিও তাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। তিরস্কারবাণ, হুলফুটানো বাক্যের কোনো পরোয়া তিনি করেননি।

এ ধরনের বিষয়েই কবি বলেছেন—

আমি যখন কিতাব অধ্যয়ন করি তার গণ্ডদ্বয় ছেড়ে
সে তখন কিতাবের প্রতি যারপরনাই অভিমান বোধ করে।

আরেক কবি বলেছেন—

গায়িকার সাথে কোলাকুলি ও দৈহিক মিলন করা যেমন প্রিয়
ইলম চর্চার জন্য বিনিদ্র রজনি আমার তদপেক্ষা অধিক প্রিয়।

ইমাম মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধি রহ. সফরাবস্থায়ও লিখতেন এবং নুসখা তৈরি করতেন

ইমাম মুহাদ্দিস ফকিহ মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধি আনসারি রহ., (জন্ম : ১১৯০ হিজরি, মৃত্যু : ১২৫৭ হিজরি) তিনি ইমাম শাফেয়ির মুসনাদটির বিন্যাস, সংক্ষেপায়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি করেছেন সফরাবস্থায়। আরাম ও পানাহারের জন্য বিরতির সময়। তিনি 'তারতিবু মুসনাদিল ইমামিশ শাফেয়ি' কিতাবটির সমাপ্তিতে বলেছেন, সংকলনটি শুরু করেছিলাম ১২২৯ হিজরি সনের

জিলকদ মাসে হজের সফরের জন্য পশুবাহিত গাড়িতে চড়ার পর। আর তা সমাপ্ত হলো ১২৩০ হিজরি সনের রবিউল আওয়াল মাসের বিশ তারিখ রোজ বুধবার আসরের পর। হারামাইন শরিফাইন থেকে ফিরে আসার সময় কুনফুজা জামে মসজিদে। আমি শুধু পানি পান করার জন্য সামান্য বিরতি ও আরামের জন্য সফর বিরতির সময়ই কেবল লিখতে সক্ষম হতাম। এটা কেবল আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত। তিনি আমাকে এমন সময় রাসুল সা.-এর সুন্নাহর সেবা করার তাওফিক দিয়েছেন, যখন সাধারণত এ ধরনের কাজ করা আদৌ সম্ভব হয় না।

অনুরূপভাবে তিনি 'লিসানুল মিজান' কিতাবটির অর্ধেক নকল করেছেন ওমরার জন্য মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে। এ সময় মাহমুদিয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত তার নিজ হাতে লেখা প্রথম খণ্ডটির শেষে লেখা আছে—

১২৫১ হিজরি সনের শাবান মাসের আটাশ তারিখে প্রথম খণ্ডটি সমাপ্ত হলো। আমরা এখন রমজান মাসে ওমরা করার উদ্দেশ্যে যাবার পথে রাবেগ নামক স্থানের নিকটে শাদোন নামক স্থানে অবস্থান করছি। এরপর দ্বিতীয় খণ্ডটি শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

সে সময়কার যুগে সফরের অবস্থা, যানবাহন ও আরামের স্থানগুলোর অবস্থা সকলেরই জানা। যদি তিনি মনে না করতেন যে, কিতাব নকল করা ও রচনা অন্যতম একটি মহান ইবাদত, তাহলে সফরে আরামের সময়টা তিনি আদৌ এ কাজে ব্যয় করতেন না।

আল্লামা আব্দুল্লাহ বালাবি রহ. বাসর রাতেও কিতাব অধ্যয়নে মগ্ন ছিলেন, নববধূর প্রতি আদৌ তাকিয়ে দেখেননি

আল্লামা মুহাম্মদ আহমদ উমর শাতেরি এ কিতাবটির (কিমাতুজ জামান) পঞ্চম সংস্করণটি পড়ার পর আমার পিতার নিকট প্রেরিত একটি চিঠিতে বলেছেন, কিতাবটি পড়ার পর আমার মনে পড়ছে আল্লামা মুফতি হাবিব আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে ইয়াহইয়া বালাবি রহ. (মৃত্যু : হাজরামওতে ১২৬৫ হিজরি সনে)-এর কথা। তার কাছে তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে পাঠানো হলো। তিনি বাসর ঘরে প্রবেশ করে দেখেন সেখানে কয়েকজন মহিলা রয়েছে। ঘটনাটি মধ্যরাতের। তাই তিনি শায়খ ইসমাইল ইবনে মুকরি ইয়ামানি শাফেয়ি (মৃত্যু : ৮৩৭ হিজরি)-এর লেখা 'আল-ইরশাদ' কিতাবটি হাতে নিলেন। ইতিমধ্যে মহিলারা

চলে গেল। কিন্তু তিনি ফজর পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা যাবৎ কিতাবটি অধ্যয়নে তন্ময় হয়ে থাকলেন। নববধূ হেলান দিয়ে বসে রইল। তিনি উক্ত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার দিকে চোখ তুলে তাকানোর কথাও ভুলে গেলেন। কারণ, তিনি ওই ইলমের অধ্যয়নে লিপ্ত ছিলেন যা তার কাছে নববধূর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। (সালমান)

আল্লাহর জন্যে আল্লামা জামাখশারির সকল মঙ্গল,

তিনি বলেন—

গায়িকার সাথে কোলাকুলি ও দৈহিক মিলন করা যেমন প্রিয়
ইলম চর্চার জন্য বিনিদ্র রজনি আমার তদপেক্ষা অধিক প্রিয়
তরুণীর বাদ্যের ধ্বনির চেয়ে বিদ্যাচর্চা বেশি প্রিয়
কিতাব, কাগজ ও পাণ্ডুলিপির আবর্জনা সরানো আমার প্রিয়।

আব্দুল হাই লখনোবি রহ. মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন অথচ তার লিখিত কিতাবের সংখ্যা ১১০ ছাড়িয়ে গেছে।

আমাদের বেশি দূরে যেতে হবে না। আব্দুল হাই লখনোবি হিন্দি—যিনি মাত্র একশ কয়েক বছর পূর্বে ১৩০৪ হিজরি সনে ৩৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। তার লিখিত পুস্তকাদির সংখ্যা একশ দশেরও অধিক। যার মাঝে কয়েক খণ্ডের কিতাবও আছে, আবার কয়েক পৃষ্ঠার ছোট্ট পুস্তিকাও আছে। তার সবগুলো কিতাবই অত্যন্ত উপকারী ও দুর্বোধ্য জটিল বিষয়-সংবলিত।

জামালুদ্দিন কাসেমি রহ. মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, অথচ রেখে গেছেন একশরও অধিক রচনাবলি

এটা নিঃসন্দেহে সময়কে কাজে লাগানো ও সময়ের প্রতি অত্যধিক যত্নবান হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

আল্লামা মুফাসসির মুহাদ্দিস ফকিহ শায়খ মুহাম্মদ জামালুদ্দিন ইবনে মুহাম্মদ সাইদ কাসেমি দামেশকি রহ. (জন্ম : ১২৮৩ হিজরি, মৃত্যু : ১৩৩২ হিজরি) মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। তিনি সময়ের প্রতি চরম যত্ন

নিয়েছেন। সময়কে কাজে লাগিয়ে ফলবান করেছেন। উচ্চ মনোবলে সুসজ্জিত হয়েছেন। এর সোনালি ফসল হলো একশরও অধিক রচনা। যার মধ্যে ছোটো-বড়ো সব ধরনের পুস্তকাদি রয়েছে।

জনাব আসেম বাইতার রহ. শায়খ কাসেমির লেখা 'আল-ফজলুল মুবিন' নামক কিতাবের সূচনায় সন্নিবেশিত তার জীবনীতে বলেন, শায়খ নিজ বয়সের স্বল্পতা ও কর্মের আধিক্যতা সত্ত্বেও একশরও অধিক কিতাব ও পুস্তিকা রেখে গেছেন। তিনি চৌদ্দ বছর বয়স থেকে শিক্ষকতা শুরু করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তা ত্যাগ করেননি। তার বহু ছাত্রদের জন্য পড়ার সময় নির্ধারিত ছিল। মসজিদে, ঘরে, দিনে, রাতে। এতকিছু করেও তিনি লেখালিখি করেছেন, সংক্ষেপায়ন করেছেন, সংকলন তৈরি করেছেন। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

একদা তিনি খালি মাথায় একটি কফি হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাউজটি কর্মহীন লোক দ্বারা ঠাসা ছিল। যারা বিনোদনে ও আনন্দ-উল্লাসে সময় কাটাচ্ছিল। তখন তার একজন ভক্তকে বললেন, আফসোস! আমি কত কামনা করেছি, সময়টা বিক্রির বস্তু হোক—যেন তাদের কাছে থেকে আমি তাদের সময়গুলো কিনে নিতে পারি।

কাসেমি রহ. নিজের ব্যাপারে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ছোটো বেলা থেকেই আমার মধ্যে পড়া, অধ্যয়ন, কিতাবের নুসখা তৈরি ও পুস্তক রচনার আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতে তার এই ক্ষুদ্র বান্দা থেকে বেকার ঘুরে বেড়ানো ও অর্থহীন কাজে সময় ব্যয় করার মানসিকতা দূরীভূত করে দিয়েছেন। ফলে সাহিত্য ও ইতিহাসের অসংখ্য কিতাব অধ্যয়ন করেছি।

তিনি 'আল-ফজলুল মুবিন'-এর ভূমিকায় বলেছেন, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমার সুযোগ হয়েছে পুরো মুসলিম শরিফ চল্লিশ দিনে পড়ার। সুনানে ইবনে মাজাহ একুশ দিনে পড়ার সুযোগ হয়েছে। 'মুয়াত্তা' উনিশ দিনে এবং 'তাকরিবুত তাহজিব' কারেকশন ও টীকা লেখাসহ দশ দিনে পড়ার সুযোগ হয়েছে। কাজেই হে তিরস্কারকারী! অলসতা ঝেরে ফেলো, ইলম অধ্যয়ন ও সৎকর্মের দ্বারা স্বীয় মূল্যবান সময়কে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করো।

তার ছেলে প্রফেসর জাফের কাসেমি তার পিতা সম্পর্কে লেখা কিতাবে বলেছেন, আব্বার প্রাচীনতম কিতাব যা আমি পেয়েছি, তা হলো একটি ছোট্ট সংকলন। যার নাম রেখেছেন 'সাফিনাহ'। ১২৯৯ হিজরি সনে তা সংকলন করেছেন।

তখন তার বয়স ছিল ষোলো। তাতে তিনি নিজের [illegible]
কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। এরপর তিনি অব্যাহতভাবে লিখে গেছেন—দিনে, রাতে, রেলে, আনন্দভ্রমণে, গাড়িতে, মসজিদে, মসজিদের সিঁড়িতে, ঘরে। আমার মনে হয় কেবল রাস্তাটাই তার কলমের অভিযান থেকে রেহাই পেয়েছিল। তার পকেটে সদা একটি কলম ও ছোট্ট একটি খাতা থাকত, যখনই কোনো ভাবনা মাথায় আসত সাথে সাথে লিখে ফেলতেন, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন।

শায়খ তাহের জাজায়েরি রহ.-এর সময় সংরক্ষণ ও ইলম অর্জনের জন্য বিনিদ্র রজনি যাপন

আল্লামা মুফাসসির মুহাদ্দিস ফকিহ হানাফি বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী শায়খ তাহের জাজায়েরি দামেশকি রহ. (জন্ম : ১২৬৮ হিজরি, মৃত্যু : ১৩৩৮ হিজরি)-এর জীবনীতে আছে, যা তার দুই শিষ্য আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ সাইদ বানি রহ. 'তানবিরুল বাসায়ের' নামক কিতাবে ও আল্লামা মুহাম্মদ কুরদ আলি রহ. 'কুনোজুল আজদাদ' ও 'আল-মুআসিরোন' কিতাবদ্বয়ে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন আজীবন অবিবাহিত। কখনো বিয়ে করেননি। তিনি বাহ্যিক পোশাক-আশাকের প্রতি তেমন যত্নবান ছিলেন না। সময় বাঁচানো, অধ্যয়ন ও লেখালিখিতে সময় কাজে লাগানোর স্বার্থে তিনি সাদাসিধে ও নিম্নমানের পোশাক পছন্দ করতেন। তিনি সারা রাত জাগ্রত থাকতেন। প্রথম প্রহরে ছাত্রদের সাথে এবং ফজর পর্যন্ত স্বীয় কিতাবাদি রচনায় ও তথ্যানুসন্ধানে। তিনি ফজরের নামাজ পড়েই কেবল ঘুমাতেন। সকল নামাজ তিনি আওয়াল ওয়াক্তে পড়তেন। সফরে, বাড়িতে, মহল্লার মসজিদে, বাজারে, রাস্তায়, দাওয়াতে, লেকচারে, সাধারণ মাহফিলে, বিশেষ বৈঠকে তথা সকল ক্ষেত্রে। নামাজের টাইম হয়ে গেলে তিনি কারও পরোয়া করতেন না, যতক্ষণ আওয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় না করেছেন।

তার কোনো সময় ইলম অর্জন বা ইলম শিক্ষাদান ব্যতীত অতিক্রান্ত হতো না। তার শিষ্য আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ সাইদ বানি রহ. বলেছেন, যিনি সারা রাত জেগে কাটিয়ে দিতেন, রাত-দিনকে একাকার করে ফেলতেন দরস, গবেষণা, সংকলন ও দাওয়াতের কাজে। তিনি আবার কী করে স্ত্রী-সন্তানদের জন্য জীবিকা উপার্জনের সময় বের করবেন? কখনো কখনো তিনি ছোটো ও লঘুভার কিতাব নিজ আস্তিনে বা পকেটে বহন করতেন, যেন সময়-সুযোগে পড়তে

পারেন। তার কোনো সময় অযথা নষ্ট হোক সেটা তিনি চাইতেন না। অনুরূপভাবে তিনি অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসও সঙ্গে বহন করতেন।

শায়খ তার সময়ের প্রতি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। এর একটা সাধারণ দৃশ্য আমরা তার জীবনে দেখতে পাই। তিনি কফি পানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাই বারবার কফি তৈরিতে যেন সময় নষ্ট না হয় এ জন্যে এক সপ্তাহের কফি একসাথে তৈরি করে রেখে দিতেন। যখনই মনে চাইত এক কাপ কফি তিনি পান করে নিতেন। এভাবে বেশ ক'দিন তিনি ঠান্ডা বাসি কফি পান করতেন। যেন তার অধ্যয়নে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। কফি পানটাও তার শুধু উপভোগ করার উদ্দেশ্যে হতো না। বরং রাত্রিজাগরণ ও উদ্যমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি পান করতেন।

কোনো মুহূর্তেই তিনি ইলম চর্চা বন্ধ করতেন না। কখনো লেখালিখি, কখনো তথ্য খোঁজাখুজি, কখনো মুজাকারাহ বা অধ্যয়ন করতেন। কোনো কিতাব তার কাছে ভালো লাগলে সেটা বারবার পড়তেন। এ জন্যেই তার জীবনের সকল কিছুতেই একটা বাস্তববাদিতা ছেয়ে থাকত। কখনো তাকে ঠাট্টা বা রসিকতা করতে দেখা যেত না।

একবার একটি চমৎকার ঘটনা ঘটে গেল। তিনি কিছু কমলালেবু ক্রয় করে ঘরে রেখেছিলেন। পরের দিনই তার সফরে যাবার ইচ্ছা হলো। ঘর থেকে বের হয়ে কয়েক গজ যাওয়ার পরই তার মনে হলো কিছু কমলালেবু সাথে করে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তার মনে পড়ল গতকাল তিনি কমলালেবু ক্রয় করেছিলেন। তাই ঘরে ফিরে গিয়ে সেগুলো আনলে সময় নষ্ট হবে ভেবে তিনি মনস্থ করলেন পথে কোথাও ক্রয় করে নেবেন। এরপর তিনি ছয় মাস পর বাড়িতে ফিরে আসেন। এসে কমলালেবুগুলো শুকিয়ে গেছে দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন।

হাকিমুল উম্মত থানবি রহ.-এর লিখিত পুস্তকাদির সংখ্যা হাজারেরও অধিক

ভারতের শায়খ হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ.—যিনি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে ১৩৬২ হিজরি সনে একাশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন—তার পুস্তকাদির সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এটা আল্লাহর দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। এ সবকিছুই সম্ভব হয় সময়ের

সদ্ব্যবহার দ্বারা। সময়ের মূল্য কেবল হাতেগোনা ক'জন আল্লাহর তাওফিকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই বোঝাতে সক্ষম হয়ে থাকেন। ফলে তারা সামান্য বয়স পেয়েও বিস্ময়কর-সংখ্যক পুস্তকাদি রচনা করে যেতে পারেন।

শায়খ জাহাবি ও শায়খ তব্বাখ রহ. মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্বেও কিতাব অধ্যয়ন করেছেন

পূর্বোক্ত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর ঘটনার মতো দুটি ঘটনা আমি জানতে পেরেছি। ঘটনা দুটি হলো আমার আব্বাজানের দুজন শায়খের। একজন হলেন আমজাদ জাহাবি রহ.। অপরজন হলেন মুহাম্মদ রাগেব তব্বাখ হলবি রহ.।

আমজাদ জাহাবি রহ. (জন্ম : ১৩০০ হিজরি, মৃত্যু : ১৩৮৭ হিজরি)-এর জীবনীতে আছে, তিনি অধিক অধ্যয়নকারী ছিলেন। এমনকি অসুস্থতার সময়ও অধ্যয়ন করতেন। মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগেও তিনি অধ্যয়ন করছিলেন।

জনাব আল্লামা মুহাম্মদ রাওয়াস কিলাজি রহ. লিখিত 'হাদিসুর রুহ' নামক কিতাবে তার শায়খ যুগের বিস্ময় মুহাম্মদ রাগেব তব্বাখ রহ. (জন্ম : ১২৯৩ হিজরি, মৃত্যু : ১৩৯০ হিজরি) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমি শায়খের কাছে তার মৃত্যুর দিন গিয়েছিলাম। তাকে তখন বিভিন্ন তোষক গদি ইত্যাদি দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছিল হেলান দেওয়ার জন্য। আমি দেখলাম, তার জিহ্বা ভারি হয়ে গেছে। চোখের পলকগুলো নিচে নেমে এসেছে। চোখ মেলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। অনেক বেশি পাওয়ারের চশমা তার চোখে ছিল। তার হাতে ছিল কিতাব। এক-দুই লাইন পড়েই তিনি ক্লান্ত হয়ে যেতেন। কিছুক্ষণ মাথা হেলান দিয়ে বসে থাকতেন। এরপর আবার পড়তে শুরু করতেন। আমি তাকে বললাম, হুজুর! এখন যদি আপনি না পড়তেন এবং কিছুক্ষণ আরাম করতেন, তো ভালো হতো। কারণ, আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে। জবাবে তিনি কিছু কথা বললেন, যা তার মুখের জড়তার কারণে আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি। কিন্তু এতটুকু আমার ধারণা হয়েছে যে, একটি মাসআলা আছে যা না জেনে তিনি মরতে চান না। তখন আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করল। আমি তাকে বললাম, আপনার যদি এতই আগ্রহ থাকে তাহলে আমাকে অনুমতি দিন; আমি আপনাকে পড়ে শুনাই। আমি কিতাবটি তার হাত থেকে নিলাম এবং পড়তে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর তার দিকে তাকালাম। তিনি যখন মাথা হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। আমি মনে করলাম, তিনি আমার পড়া শুনছেন। আমি পড়া অব্যাহত রাখলাম। এমন সময় তার ছেলে প্রবেশ

করল এবং পিতাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পেল। সে আমাকে রুমের বাইরে যেতে অনুরোধ করল। আমি বাইরে চলে গেলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমি তার মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পেলাম। আল্লাহ তায়ালা এই মনোবল ও শীর্ষ মনীষীগুলোকে রহম করুন! আমাদেরকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফিক দান করুন! (সালমান)

ইবনে আসাকের রহ.-এর শ্রোত হাদিসের কপিগুলো পৌঁছতে বিলম্ব হওয়া ও না পৌঁছা পর্যন্ত এর জন্য তার চরম অস্থিরতা

তার ছেলে হাফেজ আবু মুহাম্মদ কাসেম রহ. বলেন, আমার আব্বা অনেক কিতাব শুনেছিলেন যেগুলোর কপি তিনি তৈরি করেননি। তার সহপাঠী হাফেজ আবু আলি ইবনুল ওয়াজির রহ.-এর কপিগুলোর ওপর নির্ভর করে। ইবনুল ওয়াজির রহ. যেগুলোর কপি তৈরি করতেন আমার আব্বা সেগুলোর কপি নকল করতেন না। আর আমার আব্বা যেগুলোর কপি নকল করতেন ইবনুল ওয়াজির সেগুলোর কপি তৈরি করতেন না।

একদা কোনো এক রাতে তাকে শুনেছি। তিনি জামে মসজিদে চাঁদের আলোতে তার এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিলেন। তিনি বলেন, আমি সফর করেছি, কিন্তু যদি না করতাম তা-ই ভালো হতো। অনেক কিতাব পড়েছি, কিন্তু যদি না পড়তাম তা-ই ভালো হতো! আমি ধারণা করেছিলাম আমার সাথি ইবনুল ওয়াজির রহ. আমার শ্রোত কিতাবগুলো নিয়ে আসবে। যেমন : সহিহ বুখারি, মুসলিম, বায়হাকির কিতাবগুলো, উঁচু সনদের আজজাগুলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে মারু এলাকায় স্থায়ী হয়ে গেছে, সেখানেই সে অবস্থান করবে। আমার কিতাবগুলো আর নিয়ে আসবে না।

আমি আশা করেছিলাম যে, আমার আরেক সাথি হয়তো আসবে। তার নাম ইউসুফ ইবনে ফারওয়া জাইয়ানি রহ.। এবং আমাদের আরেক সাথি আবুল হাসান মুরাদি রহ. আসার কথা ছিল। সে আমাকে বলেছিল, আমি দামেশকে যাব, কিন্তু কই! কেউ তো দামেশকে এলো না। তাই আমার তৃতীয়বার সফর করতে হবে। বড়ো বড়ো কিতাবগুলো ও গুরুত্বপূর্ণ আজজাগুলো আনতে হবে।

অল্প কিছুদিন পরেই তার এক বন্ধু এলো। তার দরজায় কড়া নাড়ল। সে বলল, আবুল হাসান মুরাদি এসেছে। আমার পিতা তার কাছে নেমে গেলেন। তাকে স্বাগত জানিয়ে তার বাড়িতে সসম্মানে অবস্থান করালেন। সে চার বস্তা ভরে তার

শ্রোত কিতাবগুলো নিয়ে এলো। আমার পিতা দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। এবং আল্লাহর শুকর আদায় করলেন যে, তিনি অতি সহজে কোনো কষ্ট ছাড়াই তার শ্রোত কিতাবগুলো এনে দিলেন। তার আর সফর করতে হবে না। এরপর তিনি কিতাবগুলোর কপি তৈরি করতে শুরু করলেন। যখনই কোনো একটি জুজের কপি তৈরি করে শেষ করতেন, মনে হতো যেন তিনি সারা দুনিয়া অর্জন করে ফেলেছেন।' (ইবনে আসাকেরের আলোচনা শেষ হলো।)

পাঠক! এই মহান ইমাম হাফেজ ইবনে আসাকের. দামেশকি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ হলো। তাতে কত শত বিস্ময়কর অবাক করার মতো দুর্লভ ঘটনাবলি আপনি দেখেছেন। যদি তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার না করতেন, যদি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গনিমত মনে না করতেন; তাহলে এত বিশাল বিশাল গ্রন্থ তার দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভব হতো না। যা বর্তমানে কোনো একাডেমির পক্ষেও লেখা তো দূরের কথা, ছাপাও সম্ভবপর হবে না। কাজেই ভাই! সময়ের হেফাজত করুন, সময়ই সকল বরকত ও কল্যাণের ভান্ডার।

সময় সংরক্ষণের গুরুত্ব ও সময় নষ্ট করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে বিখ্যাত মিশরীয় সাহিত্যিক আহমদ আমিনের একটি প্রবন্ধ

মিশরের বিখ্যাত লেখক সাহিত্যিক ড. আহমদ আমিন (মৃত্যু : ১৩৭৩ হি.)-এর লেখা একটি প্রবন্ধের খোঁজ পেয়েছি, যার শিরোনাম হলো 'নির্লিপ্ত সময়' বা 'কর্মহীন সময়'। প্রবন্ধটি তিনি স্বরচিত 'ফায়জুল খাতির' নামক কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। প্রবন্ধটি এ পুস্তিকার বিষয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিধায় উপকারার্থে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে পুস্তিকার শেষপ্রান্তে সন্নিবেশিত করা ভালো মনে করছি। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

তিনি বলেছেন, বাসা-বাড়িগুলোতে হাজার হাজার ছাত্র চার মাস বা পাঁচ মাস গ্রীষ্মের ছুটি কাটায়। অভিভাবকরা কি কোনো দিন জিজ্ঞেস করে বা চিন্তা করে যে, এই বিশাল লম্বা সময়টা কি তাদের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও দেশের উপকারী কাজে কাটানো যায়? বাড়িতে বসা জাতির অর্ধেক অংশ নারীরা কীভাবে তাদের কর্মহীন সময়গুলো কাজে লাগাতে পারে?

সময়টা যেহেতু সম্পদ অর্জন, ইলম অর্জন ও স্বাস্থ্য রক্ষার কাঁচামাল, তাই চিন্তা করা উচিত এগুলো কী পরিমাণ নষ্ট করেছি? জীবনের কতটা অংশ বেকার নষ্ট হয়ে যায়? না তো দুনিয়ার কাজ হয়, না আখেরাতের কাজ হয়!

সময় নষ্ট করার পরিণামে সম্পদের অনেক উৎস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সময় নষ্ট করা ও সময় ব্যবহারের অজ্ঞতা না থাকলে সেই উৎসগুলো কাজে লাগানো যেত। কত অনাবাদ জমি আবাদ করা যেত, কত কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা যেত, কত ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যেত; কর্মহীন সময়ের সামান্য অংশ ব্যবহার করে!

আমাদের বিশ্বে সময় নষ্ট করার আরেকটি অশুভ পরিণতি হলো বইপত্রের অচলতা ও বইপাঠ না করা এবং অজ্ঞতায় সন্তুষ্ট থাকা। এমন কোনো লোক নেই যে অজ্ঞতার দরুন কষ্টবোধ করে। তবে এমন দেহ আছে প্রচুর যা আরামের জন্য পাগল। বইপত্রের জগতের মতো সম্পদের জগৎটাও অনুরূপ।

অল্পে তুষ্টি, সামান্য সম্পদে সন্তুষ্টি, রুটিনি কাজে ঘুম, যার জন্য কোনো কষ্ট করতে হয় না—সর্বত্র বিরাজমান। কোনো ধরনের চিন্তার উদ্রেক হয় না। তা ছাড়া রয়েছে দুর্বল চিন্তা ও বিদেশি উদ্যমীর সামনে রাস্তা খুলে দেওয়া, যে জানে সময়কে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়।

সময়ের হেফাজত বলতে আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সব সময় শুধু কাজই করবে। জীবনটা হয়ে যাবে শুধু কর্ম ও মেহনতের মাজন। যার মধ্যে থাকবে না কোনো আরাম, কোনো আনন্দ। জীবনটা হয়ে যাবে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময়, যার মধ্যে থাকবে না কোনো হাসির আলো, কোনো খুশি। আমার উদ্দেশ্য হলো যেন কর্মহীন সময়টা কাজের সময় অপেক্ষা অধিক না হয়। যেন কর্মহীন সময়টাই জীবনের মূল মেরুদণ্ড এবং কাজের সময়টা গৌণ হয়ে না যায়।

বরং আমার উদ্দেশ্য এর চেয়েও বেশি কিছু; অর্থাৎ, কর্মহীন সময়টা যেন বিবেকের অনুগত হয়, যেমন কাজের সময়টা হয়। কারণ, আমরা কাজ করি কোনো একটা উদ্দেশ্যে। কাজেই কর্মহীন সময়টাও অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় হওয়া উচিত। হয়তো স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, যেমন বৈধ ব্যায়ামজাতীয় খেলাধুলা। বা মানসিক আনন্দের জন্য যেমন বিদ্যাগত অধ্যয়ন। বা আত্মার খোরাকের জন্য, যেমন : কোরআন পাঠ, হাদিস পাঠ, নফল ইবাদত ইত্যাদি।

কিন্তু শুধু সময় হত্যা করাটাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া কোনো বৈধ উদ্দেশ্য নয়। কেননা সময়টাই জীবন। কাজেই সময়টা নষ্ট করা মানে জীবনটা নষ্ট করা। সুতরাং যারা তাদের দীর্ঘ সময়গুলো দাবা খেলা বা লুডু খেলা বা অবৈধ কাজে ব্যয় করে; তারা এমন কোনো উদ্দেশ্যে কাজ করে না যাকে বিবেক সমর্থন করে। অনুরূপভাবে তাদের উদ্দেশ্যও বিবেকসম্মত নয় যারা চা স্টলে, ক্লাবে ও

রাস্তায় আড্ডা মেরে সময় ব্যয় করে। তাদের উদ্দেশ্য হয় কেবল সময় হত্যা করা। যেন সময় তাদের অন্যতম শত্রু।

এ সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি হলো এটা বিশ্বাস করা যে, মানুষ ইচ্ছামতো তার পছন্দের বিষয়টা পরিবর্তন করতে পারে। মানুষ ইচ্ছামতো তার রুচি পরিবর্তন করতে পারে। মানুষ এমন জিনিসের রুচি তৈরি করতে পারে, যা ইতিপূর্বে তার রুচিসম্মত ছিল না। এমন জিনিসকে অপছন্দ করতে পারে যা ইতিপূর্বে সে পছন্দ করত। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ যদি তার ইচ্ছা দৃঢ় হয়, তাহলে তাদের অবসরের সময়টাকে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, বিবেকের জন্য উপকারী ও দীনের জন্য উপকারী—এই তিন ধরনের কাজের জন্য ভাগ করে নিতে পারে।

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সাধারণ মানুষ মনে করে যে, হালকা গল্প পড়া ও সস্তা বাজে ম্যাগাজিন পড়া তাদের বিবেকের খোরাকের জন্য যথেষ্ট। তারা এগুলোকে গলাধঃকরণ করে এবং জ্ঞানগত আনন্দের জন্য এগুলোকেই যথেষ্ট মনে করে। অথচ এগুলো হলো বিবেককে মাতাল করার উপকরণ বা যৌন কামনা উদ্দীপক। অথচ একটু সামান্য ধৈর্য ও ইচ্ছার দৃঢ়তা শিক্ষার্থীকে লাভজনক পাঠ ও সুস্থ অধ্যয়নের জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের মধ্যে যে-কোনো প্রকার বিদ্যায় অর্থবহ জিনিসের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। যে বিষয়টা সে পড়বে, এর মধ্যে বিস্তৃতি সৃষ্টি করবে, গভীরতা অর্জন করবে। সেটা হতে পারে সাহিত্য, বা জীববিজ্ঞান বা ফুল বা ম্যাকানিক্যাল বিষয় বা কোনো যুগের ইতিহাস বা যে-কোনো মানবিক জ্ঞান। এরপর সে সেই বিষয়ে তার আগ্রহকে শানিত করবে। এরপর তার দিনের একটা অংশকে সেই বিষয়টা অধ্যয়নের জন্য ও চর্চা করার জন্য নির্ধারণ করে নেবে।

তাহলে দেখা যাবে, সে এক ভিন্ন ধরনের মানুষে পরিণত হয়েছে। সে এক ধরনের বিশেষ শক্তির অধিকারী হয়ে যাবে। সে এক সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে। সে নিজের ও তার জাতির উপকার করতে পারবে। জাতি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় দক্ষ সন্তান সমৃদ্ধ হবে। জীবনের যে দিকটায় সে বিশেষ পারদর্শী হবে তার ওপর জাতি নির্ভর করতে পারবে।

সর্বসাধারণের বৈঠকগুলোতে তাদের আলোচনার মান উন্নত হবে। উন্নত হবে তাদের চিন্তাধারা। তাদের জীবন হবে সজীবতাপূর্ণ। একজন আরেকজনের কাছ থেকে অর্জন করতে পারবে সংস্কৃতি, বিদ্যা, সাহিত্য, চরিত্র ও সময়ের মূল্যানুধাবন।

সংস্কৃতি হবে উন্নত, বিস্তৃত হবে জ্ঞানের পরিধি। জীবন হবে উন্নত। বৃদ্ধি পাবে শক্তি। জীবনোপকরণ হবে সহজতর ও সুশোভিত।

তখন মানুষ অনুধাবন করবে যে, তারা যেমন পেটকে খাদ্য জোগায় তেমনইভাবে মেধাকে খাদ্য জোগানোও তাদের দায়িত্ব। খাদ্য ছাড়া কোনো জীবন কল্পনা করা যায় না। সময়ের হেফাজত, সময়ের সঠিক ব্যবহার ছাড়া কোনো খাদ্য জোগানো সম্ভব নয়। তখন সমাজের পরিবেশ, চিন্তাধারা, শিল্পজ্ঞান, উৎপাদন, অবদান ও উপকারিতা উন্নত হবে।

সদা তোমার অভ্যাস বানিয়ে নাও নিজেকে এই প্রশ্ন করা—আমার অবসর সময়ে আমি কী কাজ করেছি? আমি কি স্বাস্থ্য বা সম্পদ বা বিদ্যা বা নিজের বা অন্যের কোনো উপকার অর্জন করতে পেরেছি? চিন্তা করে দেখো, তোমার অবসরের সময়টা কি তোমার বিবেকের শাসনের অনুগত হয়েছে? তোমার কি কোনো প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য রয়েছে, যার জন্য তুমি তোমার মূল্যবান সময়টা ব্যয় করেছ? যদি অনুরূপ হয়ে থাকে তাহলে তুমি সফল হয়েছ। অন্যথায় সফল হওয়ার চেষ্টা করো।

প্রতিদিন সামান্য কিছু সময় নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়তো তোমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তোমাকে করে দিতে পারে কল্পনাতীত সুশৃঙ্খল ও উন্নত।

জাতি সর্বক্ষেত্রে তার জীবনের দশ ভাগের এক ভাগ উচিতমতো জীবনযাপন করে বা তার চেয়েও কম। সম্পদ উপার্জনে বলেন বা মেধাগত শিক্ষায় বলেন বা স্বাস্থ্যের অবস্থায় বলেন; সব ক্ষেত্রেই জাতি জীবনের অল্পতম অংশ সঠিক জীবনযাপন করে। বাকি জীবনটা বেকার অলসতা বা অজ্ঞতাবস্থায় বা দাবা-লুডু খেলাধুলায় বা অর্থহীন কাজে কেটে যায়। অথচ সঠিক জীবনযাপন করার পথে কোনো বাধা নেই। বাধা শুধু একটাই আছে। তা হলো, সময় ব্যয় করার সঠিক পদ্ধতিটা আবিষ্কার করতে ও অবসর সময়টাকে শরিয়ত ও বিবেকের অনুগত বানাতে ব্যর্থতা।

সময়টাই জীবন এবং সময় স্বর্ণের চেয়েও দামি

বিখ্যাত বিচক্ষণ আদর্শিক নেতা ড. হাসানুল বান্না 'সময়টাই জীবন' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে বলেন—

বলা হয় সময়টাই টাকা। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক তাদের জন্যে, যারা জাগতিক সবকিছুকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে থাকেন। কিন্তু যারা এর চেয়েও গভীর দৃষ্টি রাখেন তাদের দৃষ্টিতে মূলত সময়টাই জীবন।

হে মানুষ! এ বিশ্বে জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে যে সময়টা অতিক্রান্ত হয় সেটা ছাড়া তোমার জীবন বলতে আর কিছু আছে কি? টাকা একসময় ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এর চেয়েও দ্বিগুণ তিনগুণ তুমি আরেক সময় অর্জন করতে সক্ষম হও। কিন্তু যে সময়টা চলে যায় সেটা কি তুমি কখনো ফিরিয়ে আনতে পারবে? কস্মিনকালেও না। সুতরাং সময়টা টাকার চেয়েও অনেক দামি, হীরার চেয়েও অনেক দামি, সব ধরনের জওহর ও দামি পাথরের চেয়েও অনেক দামি। কেননা এটাই তো আসলে জীবন।

সফলতা শুধু সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও অনুকূল পরিবেশের ওপর নির্ভর করে না। বরং নির্ভর করে উপযুক্ত মুহূর্তের ওপরেও। আগেকার লোকেরা অন্তঃসারশূন্য মতামত ও অসময়ে গৃহীত অভিমত পরিহার করে চলত। উপযুক্ত সময়ে কার্য সম্পাদন হওয়াকেই তাওফিক বলে।

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

আল্লাহই দিন-রাত নির্ধারণ করেন। -সুরা মুজ্জাম্মিল : ২০

এ জন্যেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সেই গাফেলরাই, যাদের ব্যাপারে আল-কোরআনে বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি অনেক মানুষ ও জিনকে। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা বোঝে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা দেখে না। তাদের শ্রবণশক্তি আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও অধম। তারাই গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।-সুরা আরাফ : ১৭৯

নবি করিম সা. সময়ের মূল্য বোঝানোর এক চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা করেছেন এভাবে—

لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا يُنَادَى فِيهِ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا خَلْقٌ جَدِيدٌ وَأَنَا فِيمَا تَعْمَلُ عَلَيْكَ غَدًا شَهِيدٌ فَاعْمَلْ فِيَّ خَيْرًا أَشْهَدْ لَكَ بِهِ غَدًا فَإِنِّي لَوْ قَدْ مَضَيْتُ لَمْ تَرَنِي أَبَدًا قَالَ: "

প্রতিটি দিন ভোরের আলো ফুটার সাথে সাথে ঘোষণা করে, হে আদমসন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি, আমি তোমার আমলের সাক্ষী, কাজেই আমার কাছ থেকে পাথেয় সংগ্রহ করো, যা আমি আগামী দিনে তোমার সাক্ষী হব, আমি চলে গেলে আর আমাকে ফিরে পাবে না। -হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৩০৩

সুতরাং সময়ের চেয়ে দামি কোনো জিনিস এ ধরণিতে নেই। আবার সময়ের মধ্যেও তারতম্য আছে। একটি মুহূর্তের বরকত আরেকটি থেকে বেশি হয়। একটি দিন আল্লাহর কাছে আরেকটি দিন থেকে উত্তম হয়। একটি মাস আরেকটি মাস থেকে উত্তম হয়।

কবি বলেন—

নয়ন আরেক নয়ন থেকে হয় উত্তম

কেন দিন আরেক দিনের চেয়ে হয় উত্তম

রাসুল সা. অনেক হাদিসে আমাদেরকে সময়ের মূল্য বোঝার ও সময় দ্বারা উপকৃত হওয়ার দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ عاجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي ما اللهُ صَانِعٌ فِيهِ، وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي ما اللهُ قاضٍ فِيهِ

মুমিন দুটি ভয়ের মাঝে আছে : নগদ যা চলে গেছে, সে জানে না এর মধ্যে আল্লাহ কী করবেন, অপরটি অনাগত যা বাকি রয়েছে, সে জানে না আল্লাহ তাতে কী করবেন। -শুআবুল ইমান লিল-বায়হাকি

সুতরাং বান্দার উচিত নিজের থেকে নিজের জন্য গ্রহণ করা। তার দুনিয়া থেকে আখেরাতের জন্য গ্রহণ করা। বৃদ্ধ হওয়ার আগেই তারুণ্য থেকে উপকৃত হওয়া। জীবন থেকে মৃত্যুর পূর্বেই উপকৃত হওয়া।

প্রিয় বন্ধু! সময়কে গনিমত মনে করো। সময়টা তরবারির ন্যায়। শিথিলতা পরিহার করো। এর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কিছু নেই। মকবুল আমল ও মূল্যবান সময়ের জন্য আল্লাহর কাছে তাওফিক প্রার্থনা করো।

সময়টা নগদ সম্পদ, সময়টা কর্তনকারী তরবারি

বর্ষীয়ান প্রাজ্ঞ আলেম সাইয়েদ আহমদ হাশেমি স্বরচিত কিতাব 'দিওয়ানুর ইনশা'তে তার একটি প্রবন্ধে বলেছেন, সময় একটি মহা সম্পদ। একটি মহৎ নির্ভুল দর্শন আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, সময় অত্যন্ত দামি ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। সময়ের হেফাজত করা অত্যন্ত জরুরি। যেন খেলাধুলা ও অহেতুক কাজে নষ্ট না হয়। বরং উপকারী কাজ ও মেহনতে, উন্নত মর্যাদা অর্জনে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে যেন ব্যয় হয়। প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই যে নিজ বয়সটাকে ভালো কাজে ও অমর কীর্তি অর্জনে ব্যয় করে। যা তাকে সুনাম ও সুযশ এনে দেয়।

আমার জীবনের শপথ! সময় অবশ্যই দামি। এর চেয়ে আরও বেশি দামি তার মধ্যে ভালো কাজ হওয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জিত হওয়া, শিক্ষাদান ও গ্রহণের কাজ হওয়া, ব্যবসার প্রসার ঘটা, যেন মুনাফা অর্জিত হয়, শিল্পের উন্নতি হওয়া, কিতাবাদি লিখিত হওয়া, নতুন জিনিস আবিষ্কার করা, বিভিন্ন মহৎ কর্ম সম্পন্ন হওয়া ও গর্ব, সম্মান ও গৌরবময় ঐতিহ্যের ময়দানে সৎকর্মশীলদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়া।

সময়ের হেফাজত সততা, আমানতদারি, প্রতিশ্রুতি পালন, ইচ্ছার দৃঢ়তা ও মনোবলের দৃঢ়তার পরিচায়ক। কারণ, অলস ব্যক্তি দুর্বলকর্মা। দুর্বলচেতা ব্যক্তি স্বীয় উদাসীনতা ও আলস্যের দ্বারা নিজের ও অন্যের ক্ষতি করে। নিজ সময়কে অনর্থক নষ্ট করে। বড়োদের কাছে তার মর্যাদা হ্রাস পায় এবং অনুসারীরা তাকে অপছন্দ করে। লোকেরা তাকে ধুরন্ধর কাপুরুষ নিকৃষ্ট মনের অধিকারী অলস মনে করে। তার জীবন হয় শুষ্ক সংকীর্ণ; প্রশস্ত নয়। তাকে তুমি দেখবে সে সদা কষ্টকর জীবনযাপন করছে। পক্ষান্তরে যে নিজের সময় হেফাজত করে, সে উদ্যমী, সৌভাগ্যবান ও উৎফুল্ল থাকে। তার জীবন হয় সুখময়।

তিনি তার প্রবন্ধে আরও বলেছেন, সময় তরবারির মতো। যদি তুমি তাকে না কাটো তাহলে সে তোমাকে কেটে দেবে।

কবি বলেন—

অলসতায় আজকের কাজ রাখি না আগামীর জন্যে, নিশ্চয় আজটি মূলত কাল হয় অক্ষম-অলসদের জন্যে।

জি হ্যাঁ, নিশ্চয় সময় এক ঘাতক তরবারি ও ঝলমলে বিদ্যুৎ। সুযোগ লুফে নেওয়া ও হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাযুক্ত বিষয়ে

অবহেলা না করা সতর্কতার প্রমাণ।

কবি বলেছেন—

সুযোগ লুফে নাও, অন্যথায়

সেটা হবে কাঁটা তোমার গলায়।

সবচেয়ে বড়ো বিপদ হলো, অনর্থক সময় কেটে যাওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَأَنْفِقُوا مِنَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

তোমরা আমার দেওয়া রিজিক থেকে দান করো তোমাদের মৃত্যু আসার আগেই। মৃত্যু আসার পর এ কথা বললে কোনো লাভ হবে না যে, হে পরোয়ারদেগার, আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলেন না? -সুরা আল-মুনাফিকুন : ১০

জনৈক দার্শনিক বলেছেন, সন্ধ্যা হওয়ার আগে শুভ্র দিবসটাকে মহাসুযোগ মনে করো।

জনৈক কবি বলেছেন—

বস্তুর শুরুটা যদি তুমি করে দাও ধ্বংস,

তাহলে শেষটাও অবশ্যই হবে ধ্বংস।

জীবন স্বল্পমেয়াদি, সময়ের বিন্যাস তাকে দীর্ঘ করে। মানুষ চক্ষুষ্মান, কিন্তু সময়ের মূল্য অনুধাবনে অন্ধ।

কবি বলেছেন—

মানুষকে করে খুশি সময়ের গমন

সময়ের গমন মূলত তারই গমন।

সুতরাং যে ব্যক্তি সচেতনতাকে প্রদীপ হিসেবে গ্রহণ করে, সুযোগের সদ্ব্যবহারকে মূল ভিত্তি হিসেবে মেনে নেয়, জটিল বিষয়গুলোও তার জন্য সহজ হয়ে যায়, মানুষের হৃদয়ে তার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, কঠিন বিষয়ের বোঝা তার জন্য হাল্কা হয়ে যায়। খুলে যায় তার জন্য কল্যাণের সকল দরজা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, নিঃসন্দেহে সুযোগটা তার জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, সে দিশা পায় না কীভাবে কাজ করবে। কেননা, সে তো সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে। অতীত তো আর ফিরে আসবে না। ভবিষ্যৎ তো তার হাতে নেই।

কবি বলেছেন—

সুযোগ হারিয়ে ফেলে দুর্বলমনারা

কোনো জিনিস যখন হয় তার হাতছাড়া

নাই তার উপায়, কপালকে দোষারোপ ছাড়া।

যে সময়টা মানুষের কোনো উপকার বা মুনাফা অর্জন ছাড়াই চলে যায়, সেটাকে বিবেকমান মানুষ তার জীবনের অংশ মনে করে না। পক্ষান্তরে, মূর্খরা সেটাকে সৌভাগ্য ও কল্যাণ ভাবে।

কবি বলেছেন—

ইলম অর্জন, সৎকর্ম উপার্জন ছাড়া যদি একটি দিন গত হয়, আমি মনে করি সেটা আমার বয়সের অন্তর্ভুক্ত নয়।

জনৈক দার্শনিক বলেছেন, কোনো কাজকে নিজ সময় থেকে বিলম্বিত করো না। কেননা, বিলম্ব করে যে সময়ের দিকে ঠেলে দেবে সে সময়ের জন্য তো অন্য কাজ রয়েছে। তখন একাধিক কাজের চাপ তুমি সহ্য করতে পারবে না। কেননা কাজের ভিড়ে ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক।

মোটকথা হলো, সময় নষ্ট করার মতো ক্ষতিকর আর কিছু নেই। তা যত দামিই হোক না কেন। তুমি যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নষ্ট করে ফেলো বা কোনো দামি উপহারসামগ্রী নষ্ট করে ফেলো, তাহলে কোনো না কোনো কৌশল অবলম্বন করে সেটা আবার অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু যদি তুমি তোমার জীবনের কোনো মুহূর্ত নিয়ে অবহেলা করো এবং সেটা নষ্ট করে ফেলো কোনো কল্যাণ বা

সুনাম অর্জন ছাড়াই, তাহলে সেটা তুমি আদৌ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে না। যদিও তুমি দুনিয়া ভরা স্বর্ণ ব্যয় করো তা ফিরিয়ে আনার জন্য। সুতরাং সময়টা নিশ্চয় স্বর্ণ ও দামি জওহর অপেক্ষা অধিক দামি এবং সব ধরনের দামি বস্তু অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সময়ের সদ্ব্যবহার ও কাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ গাজালির অমূল্য বাণী

আল্লামা মুহাম্মদ গাজালি সময়ের মূল্য অনুধাবন, সময় দ্বারা উপকৃত হওয়ার আগ্রহ ও সময় নষ্ট করার ব্যাপারে সতর্ক করা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের মাধ্যমে তার রচিত 'খুলুকুল মুসলিম' নামক কিতাবটি সমাপ্ত করেছেন। নিম্নে তা থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ পেশ করা হলো :

তিনি বলেন—

সময় দ্বারা উপকৃত হওয়া ও

সময় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

হারিয়ে যাওয়া সব বস্তুই তুমি ফিরে পেতে পারো। কিন্তু সময় এর ব্যতিক্রম। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়ার কোনো আশা থাকে না। তাই সময়টা হলো মানুষের সবচেয়ে দামি সম্পদ। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত তার দিনগুলোকে চমৎকার সম্পদের কৃপণ মালিকের মতো স্বাগত জানানো। অধিক তো দূরের কথা, সামান্য সময়ের হেফাজতেও অবহেলা না করা। এবং প্রতিটি জিনিসকে উপযুক্ত স্থানে রাখা, তা যত কম গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন।

নিশ্চয় প্রকৃত মুসলিম সময় সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন হয়। কেননা, সময়টাই তার জীবন। যদি সে সময়টাকে নষ্ট হতে দেয় এবং হিংস্র প্রাণীদেরকে সুযোগ দেয় সময়টাকে ছিনিয়ে নিতে তাহলে সেটা হবে তার আত্মহত্যার নামান্তর।

মানুষ নিরন্তর দ্রুত আল্লাহর দিকে অগ্রসরমান। পৃথিবীর প্রতিটি আবর্তন একটি নতুন প্রত্যুষ নিয়ে আসে। পৃথিবীর প্রতিটি আবর্তন পান্থপথের একটি স্তর, যার মধ্যে কোনো থেমে থাকা নেই। এই সত্যটা অনুধাবন করা, তাকে নখদর্পণে রাখা এবং তার আগপাছ ভেবে দেখা কি প্রতিটি মানুষের জন্য বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয়?

কাল নিজ গতিতে সফররত, এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তির নিজেকে থেমে আছে বলে মনে করা আত্মপ্রতারণার শামিল। এটা দৃষ্টির ভ্রম, যেমন রেলের আরোহীর

কাছে মনে হয় সব জিনিস চলছে; কিন্তু সে নিজে বসে আছে। অথচ বাস্তবতা হলো কাল মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা সময়ের মূল্য বুঝে। সময়ের গুরুত্ব নির্ধারণ করে। ইসলাম এই অমূল্য বাণীটিকে সমর্থন করে, 'সময় তরবারির মতো। তুমি যদি তাকে না কাটো তাহলে সে তোমাকে কেটে দেবে।' এই বাস্তবতাটা অনুধাবন করা ও এর নির্দেশনা মোতাবেক চলাকে ইমানের প্রমাণ ও তাকওয়ার নিদর্শন মনে করে।

ইসলাম তার বড়ো বড়ো ইবাদতগুলোকে দিনের বিভিন্ন অংশে ও বছরের বিভিন্ন মৌসুমে ভাগ করে দিয়েছে। পাঁচটি নামাজ পুরো দিনটাকে ঘিরে রাখে। নামাজের সময়গুলো দিনের গতির সাথে আবর্তিত হয়। শরিয়তে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে যে, জিবরাইল আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতরণ করেছেন নামাজের সময়ের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করার জন্য। যেন একটি সূক্ষ্ম মজবুত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যা ইসলামি জীবনকে বিন্যস্ত করবে ও মিনিট দ্বারা পরিমাপ করবে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

ঘূর্ণায়মান আকাশের গতির সাথে দিনের পর রাত আছে এবং রাতের পর দিন আসে। রাব্বুল আলামিন এটাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। মানুষের জন্য এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিষয় যে, তারা এই বিন্যস্ত পৃথিবীতে তাদের জীবনটাকে বেকার মনে করবে। বস্তুত এটা এক দীর্ঘ প্রতিযোগিতার ময়দান। যে প্রতিযোগিতায় কেবল সেই বিজয়ী হবে, যে তার রবকে চিনে। তার অধিকারকে স্মরণ করে, তার নিয়ামতের শুকর করে, যে মহা আরাম লাভের জন্য বছরসমূহের বিরতিহীন আবর্তন-বিবর্তনের সাথে সাথে বিরতিহীন মেহনত ও কষ্টের ধারা অব্যাহত রাখে।

তোমার বয়সটা তোমার অনেক বড়ো পুঁজি। তোমাকে অনতিবিলম্বে এর খরচ ও ব্যয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাসুল সা. বলেছেন :

لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدٍ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ اربع خِصَالٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَصَابَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ»

চারটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা দুটো সরাতে পারবে না। তার বয়স সম্পর্কে কোথায় সে ব্যয় করেছে? তার তারুণ্য সম্পর্কে কোথায়

সে কাজে লাগিয়েছে? তার সম্পদ সম্পর্কে কোথেকে সে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে? তার ইলম সম্পর্কে সে কী আমল করেছে? -তিরমিজি শরিফ

ইসলাম তার অনেক নির্দেশাবলি ও নিষেধাজ্ঞাসমূহে সময়ের মূল্যের প্রতি লক্ষ রেখেছে। ইসলাম যখন অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকাকে ইমানের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছে, তখন বেকার ও উদাসীন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায়ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। যারা একে অপরকে ডাকে আর বলে, এসো বিনোদনের মাধ্যমে সময় কাটাই। অথচ এই বোকাগুলো জানে না যে, এটা হলো জীবন নিয়ে খেলা করা। এভাবে সময় কাটানো ব্যক্তিকে ধ্বংস করার নামান্তর এবং সমাজকে নষ্ট করার উপায়। একটি প্রাজ্ঞ কথা যা মানুষের হৃদয় থেকে উধাও হয়ে যায় তা হলো :

সময়ের তুলনায় কাজ অনেক বেশি। সময় নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকে না। সে হয়তো খাঁটি বন্ধু নয়তো ভয়ানক শত্রু।

হাসান বসরি রহ.-এর একটি অন্যতম বাণী হলো, প্রতিদিন সুবহে সাদেক হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দেয়, হে আদমসন্তান! আমি এক নবীন সৃষ্টি। আমি তোমার আমলের সাক্ষী। কাজেই আমার থেকে সৎকর্মের মাধ্যমে পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। কারণ, আমি কিয়ামত পর্যন্ত আর ফিরে আসব না।

এই প্রাজ্ঞ বাণীসমূহ ইসলামের অন্তর্নিহিত উৎস থেকে নির্গত। এবং ইহজীবন থেকে (পরকালের) বৃহৎ জীবনে জন্য উপকার লাভ করার ব্যাপারে ইসলামের মহান শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা থেকে উৎসারিত। বান্দার অন্তরে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানোর ও এক প্রচেষ্টা থেকে আরেক প্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া আল্লাহর বিশেষ দান ও তার তাওফিকের প্রমাণ।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, সাধারণ মানুষ তাদের সময়গুলো বেকার নষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করে না। এবং এই অপরাধের সাথে আরেকটি অপরাধ করে থাকে। তা হলো, অন্যের সময়ের ওপর আক্রমণ করে সেগুলোকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। তারা কর্মপ্রিয় লোকদের কাছে তাদের একান্ত কাজের সময়ে ঢুকে যায় তাদেরকে মূল্যহীন কাজে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

রাসুল সা. সত্যই বলেছেন যে :

"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ

দুটি নিয়ামত এমন যাতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি হলো সুস্থতা, আরেকটি হলো মুক্ত সময়। -বুখারি ও মুসলিম

ইসলাম যে সময়কে উত্তম পন্থায় কাজে লাগানোর শিক্ষা দিয়েছে, এর অন্যতম প্রমাণ হলো, সে একটি কাজ সদা করার নির্দেশ দিয়েছে, যদিও কাজটি সামান্য হয়। এবং বিচ্ছিন্নরূপে অধিক কাজ করাকে অপছন্দ করেছে। কেননা, অল্প কাজ সব সময় করা ধারণাতীতরূপে সামান্য কাজকেও পাহাড়সম বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে হঠাৎ চরম আগ্রহ জাগল আর জানপ্রাণ দিয়ে অধিক পরিমাণে সেটা করতে শুরু করল; কিছুদিন পর ক্লান্ত হয়ে একদম সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকল—ইসলাম এটা পছন্দ করে না।

ইসলাম যে সময় সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে—এর আরেকটি প্রমাণ হলো, ইসলাম সকাল সকাল কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। ইসলাম চায়, প্রতিটি মুসলিম তার দিনের কাজগুলো শুরু করুক পূর্ণ উদ্যম ও আগ্রহের সাথে, পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে। কেননা, দিনের প্রথমভাগ দ্বারা উপকৃত হওয়ার আগ্রহ বাকি দিনটা বেকার নষ্ট না করার প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

ইসলামি জীবনব্যবস্থা দিনের শুরুটা নির্ধারণ করে ফজর থেকে। সূর্যোদয়ের আগেই পূর্ণ জাগরণকে ফরজ সাব্যস্ত করে। এমন রাত্রিজাগরণকে অপছন্দ করে, যা ফজরের নামাজকে টাইম ছাড়া করে। হাদিস শরিফে আছে—

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে দিনের অগ্রভাগে বরকত দান করো।

এটা অত্যন্ত উদাসীনতা ও বঞ্চনার কারণ যে, একদল লোক সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমাবে আর সূর্য উদিত হবে এমতাবস্থায় যে, তারা ঘুমের ঘোরে অচেতন থাকবে। অথচ তখন আরেকটি দল তাদের জীবনোপকরণ ও আখেরাতের কল্যাণ সন্ধানে নিমজ্জিত রয়েছে। হজরত ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَرَّ بِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ مُتَصَبِّحَةٌ، فَحَرَّكَنِي بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: "يَا بُنَيَّةُ قَوْمِي اشْهَدِي رِزْقَ رَبِّكِ، وَلَا تَكُونِي مِنَ الْغَافِلِينَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

একদা রাসুল সা. আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন আমি সকাল বেলায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। তিনি স্বীয় পা মুবারক দ্বারা আমাকে নাড়া দিলেন। এরপর বললেন, হে বৎস! উঠো, তোমার রবের রিজিক অবলোকন করো। তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা সুবহে সাদেক ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের রিজিক বণ্টন করেন। -শুআবুল ইমান লিল-বায়হাকি

তখন অলস ও কর্মঠদের মাঝে পার্থক্য রচনা করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার যোগ্যতা অনুসারে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রদান করা হয়।

জীবনটা অত্যন্ত খাটো। আর বর্তমান কাল—যার আওতায় মানুষ জীবনযাপন করছে—অত্যন্ত সংকীর্ণ। বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত হাদিসে আছে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ

রাসুল সা. বলেছেন, হে লোকসকল! তোমরা সাধ্যমতো আমল করো। কারণ, আল্লাহ বিরক্ত হন না যতক্ষণ তোমরা বিরক্ত না হও। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল সেটাই যা সব সময় হয়; যদিও পরিমাণে অল্প হয়। -বুখারি, মুসলিম

যুগ একটি অলৌকিক বিষয়। কোনো মেধা তার আসল তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সক্ষম নয়। আমরা কেবল বস্তুর ওপর তার প্রভাব দেখেই তাকে চিনতে পারি। সম্ভবত নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতার রহস্য তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। যিনি যুগ ও কালের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি সম্পর্কে অবগত, কেবল তিনিই তাকে ভালো করে চিনেন।

দীন ও দুনিয়ার প্রত্যেক কাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করার গুরুত্ব

হজরত রহ. বলেন, দুনিয়ার কোনো কাজের মধ্যে যদি বিশৃঙ্খলা এবং অনিয়ম করা হয়, যেমন এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে দিলো, খানাপিনার ব্যাপারে সামঞ্জস্যতা ও নিয়মের প্রতি লক্ষ রাখা হলো না, এমনটি যেমন দুনিয়ার বিচারে ক্ষতিকর তেমনইভাবে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম আত্মিক বা বাতেনি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর।

এক বুজুর্গের ঘটনা, সে বুজুর্গের দরবারের নিয়ম ছিল, যখন কেউ তার কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য আসত তখন ওই বুজুর্গ সাথে সাথেই তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন না; বরং খানা খাওয়ার সময় হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। দরবারের খাদেমদের প্রতি হুকুম ছিল, কোনো নতুন আগন্তুকের জন্য খানা নিয়ে যাওয়ার সময় প্রথমে ওই খানা বুজুর্গকে দেখিয়ে নিতে হবে। আবার যখন তার খানা শেষ হবে তখন অবশিষ্ট খানা ফেরত নেওয়ার সময়ও বুজুর্গকে দেখিয়ে নিতে হবে। এ নিয়মে ওই বুজুর্গ অবিশষ্ট খানা দেখে ধারণা নিতেন যে, লোকটির মাঝে নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলাবোধ আছে কি না। যেমন : লোকটি যে পরিমাণ রুটি খেয়েছে সে পরিমাণ ঝোল-তরকারি খেয়েছে কি না। যদি এমনটি হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে সে বিশুদ্ধ মানসিকতাসম্পন্ন লোক। পক্ষান্তরে যদি কমবেশি হয় তবে তা লোকটির বিশৃঙ্খল হওয়ার প্রমাণ।

এরপর যার মাঝে এ ধরনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ করতেন তাকে মুরিদ করার ব্যাপারে বুজুর্গ অপারগতা প্রকাশ করে দিয়ে বলতেন, আমার এখানে বাইআত হয়ে তোমার ফায়দা হবে না, তোমার মানসিকতার মাঝে অনিয়ম ও শৃঙ্খলাহীনতা রয়েছে। তুমি অন্য কোনো শাইখের দরবারে গিয়ে বাইআত হও।

নিরর্থক ও বেহুদা আলোচনা মানুষকে বড়ো গোনাহে লিপ্ত করে

হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ.-এর দরবারে একবার দুজন লোক এলো বাইআত হওয়ার জন্য। তারা মসজিদের হাউজে অযু করতে বসে পরস্পর কথা বলতে শুরু করল। একজন বলল, আমাদের হাউজটি এ হাউজ থেকে অনেক বড়ো। হঠাৎ শাইখ এ কথাটি শুনে ফেললেন। এরপর তারা দুজন শাইখের দরবারে উপস্থিত হলো এবং তাদেরকে বাইআত করার আবেদন জানাল। তখন শাইখ প্রশ্ন করলেন, আপনাদের হাউজটি এখানকার হাউজ থেকে কতটুকু বড়ো? একজন জবাব দিলো, তা তো বলতে পারব না। তখন শাইখ বললেন, যান,

বাড়ি গিয়ে মাপঝোক করে আসুন। শাইখের কথামতো তাদের পুনরায় সফর করে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছতে হলো। তারা বাড়ি পৌঁছে পরিমাপ করে দেখল যে, তাদের হাউজটি মাত্র এক বিঘত বড়ো। এরপর তারা পুনরায় দরবারে ফিরে এলো এবং জানাল যে, হজরত, আমি পরিমাপ করে এসেছি, সে হাউজটি এ হাউজ থেকে মাত্র এক বিঘত বড়ো। এ কথা শুনে শাইখ বললেন, আপনি তো বলেছিলেন অনেক বড়ো, এক বিঘত বড়ো হলে তা তো অনেক বড়ো হয় না।

আপনাদের এ কথার দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনাদের মন-মানসিকতায় সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে সতর্কতা নেই, সুতরাং আপনারা এ তরিকতের পথে চলবেন কী করে?

ওপরের বিষয়টি থেকে বোঝা যায় যে, বিশিষ্ট বুজুর্গানে দীনের পদ্ধতি এই ছিল যে, তারা মুরিদদেরকে বিভিন্ন ওজিফা ও নফল আমলের সবক দেওয়ার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান শুরু করার পূর্বে তাদের বাহ্যিক আমলকে দুরস্ত করে নিতেন এবং বিভিন্ন খারাপ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস সৃষ্টি করাতেন। বর্তমানে অনেক মাশাইখ এসব বিষয় লক্ষ করেন না। যার কারণে ফলাফল এই হয় যে, জিকির-আজকার ও ওজিফা তাদের খুব মশক হয় ঠিক, কিন্তু খারাপ অভ্যাসগুলো আগের মতোই ভেতরে থেকে যায়। হালাল-হারামের পার্থক্য, সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে সতর্কতা ইত্যাদি ভালো স্বভাবগুলো ভেতরে আসে না, ফলে তারা তরিকতের দুর্নামের কারণ হয়।

লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতার শিক্ষা

এক ব্যক্তি হজরত রহ.-এর বরাবরে চিঠি লিখল যে, আমি যুবক বুজুর্গের হাতে বাইআত হয়েছি। এমতাবস্থায় একবার আমি খাবে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি যে বুজুর্গের হাতে বাইআত হয়েছ, তার সাথে তোমার লৌকিকতামুক্ত অবস্থা খুব বেশি, তাই তার দ্বারা তোমার উপকার হবে না, বিধায় তুমি মাওলানা আশরাফ আলি সাহেবের কাছে গিয়ে তার থেকে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করো।

হজরত হাকিমুল উম্মত রহ. এ পত্রের জবাবে লিখলেন, তুমি তোমার বর্তমান শাইখ থেকে তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এ কথা লিখিয়ে পাঠাও যে, 'এ লোকটি নির্ভরযোগ্য, তার কথা নির্ভর করার মতো।' (অর্থাৎ, হজরত বলতে চাচ্ছেন যে, তুমি যে খাবের কথা আমার কাছে লিখেছ, তা যে তুমি ঠিকই লিখছ তা আমি বুঝব কীভাবে, এ ব্যাপারে বর্তমান শাইখ যদি আমাকে এ কথা বলে

দেন যে, তুমি যা বলবে তা নির্ভর করার মতো; তবেই আমি তোমার কথা বিশ্বাস করে তোমাকে আমার কাছে বাইআত হওয়ার অনুমতি দিতে পারি।)

অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা গেছে যে, অনেকে বুজুর্গানে দীনের নৈকট্যলাভের জন্য বিভিন্ন অবাস্তব ঘটনা ও স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে থাকে, যা তাদের নিজেদের জন্য ফিতনার কারণ আর অন্যদের জন্য পেরিশানি ও অস্থিরতার কারণ হয়। হজরত রহ. নিজে এ পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বরকম অনিষ্টতার বিষয়গুলো সমূলে বিদূরিত করে রেখেছেন এবং পূর্বের শাইখের অন্তরকে ব্যথিত করা থেকেও রক্ষা করেছেন।

প্রত্যেক কাজ সীমার মধ্যে থেকে করার প্রয়োজনীয়তা

হজরত রহ. বলেন, আল্লাহ পাকের খাশিয়্যত ও ভয়ই হলো সকল সৌন্দর্য ও মঙ্গলের উৎসমূল এবং এর ফজিলতও বিরাট। এর পরেও যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা মানুষকে অকর্মণ্য ও বেকার করে দেয়। এ জন্য হাদিসে পাকে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে খাশিয়্যতুল্লাহ বা আল্লাহর ভয় জাগ্রত করার জন্য যে দুআর কথা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন—

اللهم اقسم لى من خشيتك ما تحول به بينى و بين معاصيك

আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার খাশিয়্যত ও ভয় এ পরিমাণ দান করুন; যা আমার গুনাহ করার পথে অন্তরায় এ প্রতিবন্ধক হতে পারে।

ওপরের আলোচনায় 'আপনার ভয় এই পরিমাণ দান করুন যা আমার গুনাহ করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে' বলে যে কথাটি বলা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে, যদি মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায় তবে তা মানুষের সহ্যসীমার ভেতরে থাকে না, ফলে তা মানুষকে বেকার ও অথর্ব বানিয়ে দেয়।

এর মোকাবিলায় আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ লাভ দর্শনাকাঙ্ক্ষাও অনেক বড়ো নিয়ামত। তবে সে ক্ষেত্রে দুআ করার জন্যও হাদিস শরিফের বাক্য নিম্নরূপ :

وضوقا الى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার সাক্ষাৎ লাভ ও দর্শনাকাঙ্ক্ষা দান করুন এবং তা যেন এমন কঠিন রোগ কিংবা কঠিন বিপদ ও ফিতনার কারণ না হয়, যে রোগ বা বিপদের কারণে আমি মওতের আকাঙ্ক্ষা করতে বাধ্য হই।

মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ ও দর্শন লাভের পথ তো পরিষ্কার; আর তা হলো ইন্তেকাল। ইন্তেকাল করা ছাড়া এমনটি সম্ভব নয়। এ কারণে মওতকে আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ ও দর্শন লাভের জন্য প্রিয় মনে করাটাও একটা বড়ো নিয়ামত। কিন্তু কোনো কোনো সময় মানুষ কোনো অসহ্য কষ্ট কিংবা বিপদের কারণে মওতের আকাঙ্ক্ষা করতে বাধ্য হয়। সে ধরনের মুসিবত তো প্রশংসনীয় নয়। এ কারণে আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহের বিষয়টিকেও এ কথাটির সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

দেওবন্দের বিশিষ্ট মুরব্বিগণের মাঝে আল্লাহ পাকের ভয় ও বিরোধীদের সাথে আচরণ

সাইয়্যেদুত তায়েফাহ বা আধ্যাত্মিক কাফেলার সরদার হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. যখন বিদআতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে খণ্ডনমূলক কিছু পুস্তক লিখলেন, তখন বিদআতি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে গালিগালাজের ঝড় বইতে লাগল। দু-একজন কট্টর ও প্রসিদ্ধ বিদআতি হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর বিরুদ্ধে বেশ কিছু বইপত্রও লিখল। যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর প্রতি বিভিন্ন কটূক্তি ও গালমন্দে পূর্ণ ছিল। সেসব বইপত্র তারা একের পর এক ধারাবাহিকভাবে প্রচার করে যাচ্ছিল। হজরত গাঙ্গুহি রহ. তখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তখন (হজরত শাইখুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া রহ.-এর পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহেব কান্ধলভি রহ. হজরত রহ.-এর বিশেষ খাদেম ও হজরতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। যেসব চিঠি হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর বরাবরে আসত সেগুলো তিনি হজরত রহ.-কে পাঠ করে শুনাতেন এবং জবাব লেখার দায়িত্বও তার ওপরই ন্যস্ত ছিল। ওই সব চিঠির সাথে ওই বিদআতিদের লেখা বইপত্রও থাকত। (হজরত রহ.-কে সেগুলো পড়েও শুনানো হতো)। হঠাৎ বেশ কিছুদিন যাবৎ হজরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব ওই ধরনের কোনো বইপত্র হজরত রহ.-কে পড়ে শুনাচ্ছেন না দেখে হজরত গাঙ্গুহি রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, 'মৌলভী ইয়াহইয়া! আমার বন্ধুরা কি এখন আমাকে স্মরণ করা ছেড়ে দিয়েছে? অনেক দিন হলো তাদের কোনো চিঠিপত্র আসছে না যে? তখন মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহেব আরজ করলেন যে, ওদের বই তো বেশ কয়েকটাই এসেছে, কিন্তু সেগুলো আমার পড়তে ইচ্ছে করে না। হজরত রহ. জানতে চাইলেন, কেন? তখন মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব বললেন, এগুলো তো গালিগালাজে পূর্ণ। এ কথা শুনে প্রথমে হজরত রহ. বললেন, আরে মিয়া, দূর থেকে গালি দিলে তাও কি মানুষের গায়ে লাগে নাকি? এরপর তিনি বললেন, সে

বই ও চিঠিগুলো আমাকে অবশ্যই পাঠ করে শোনাও। আমরা তো এ নিয়তে শুনব যে, তার মধ্যে কোনো কথা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তবে তা গ্রহণ করব; আর সঠিক অর্থেই যদি তারা আমারেদ কোনো ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করে থাকে তবে সেমতে আমরা নিজেদের সংশোধন করে নেব।

এরাই হলেন সত্যসন্ধানী, আল্লাহভীরু আলেম। যাদের কারও সাথে কোনো মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে তাও হতো একমাত্র আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য এবং যারা বিরুদ্ধবাদীদের গালমন্দের সময়ও প্রতিশোধস্পৃহা এবং নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ ও বিভিন্ন তাবিল বা ব্যাখ্যা খোঁজ করার পরিবর্তে নিজের শুদ্ধি ও সত্যানুসন্ধানের পথ খুঁজে নেন।

ওইসব লোক কত বড়ো জালিম, যারা এ সকল বুজুর্গানে দীনের ওপর বিভিন্ন অপবাদ লাগিয়ে তাদের দুর্নাম ছড়িয়েছে এবং সাধারণ লোকদেরকে তাদের লেখা বইপত্র পড়তে এবং তাদের সান্নিধ্যে গমন করতে বারণ করছে। একটা বাস্তব কথা হচ্ছে, যারা শুধু দূরে বসে বুজুর্গানে দীনের প্রতি বদনাম-দুর্নাম ও কুধারণা করে বসে থাকেনি, বরং তাদের কাছে এসে তাদের সংস্পর্শ লাভ করেছে, তাদের লেখা বইপত্র ইনসাফের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ করেছে, তারা এমনিতেই তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। তাদের ভুল ধারণাও ভেঙে গেছে। বিভিন্ন মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে যদি এ পন্থা অবলম্বন করা হয়, তবে মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পারিক লড়াই-ঝগড়ার ফিতনা-ফ্যাসাদ আর বাকি থাকতে পারে না। মতপার্থক্যও তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে। কিন্তু এ জন্য প্রয়োজন আল্লাহ পাকের ভয় ও অহংকারমুক্ত হৃদয়। বর্তমানে যার ব্যাপক অভাব ও দুর্ভিক্ষ লক্ষ করা যাচ্ছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হজরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম রহ.

হজরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম রহ.-এর ইলমি ও আমলি যোগ্যতা ও পূর্ণতা সম্পর্কে অবগত নন এমন কোনো সচেতন মুসলমান সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার বিনয় ও নম্রতার অবস্থা এই ছিল যে, যখন তিনি জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজনীয়তার দিক অনুভব করলেন, তখন তা পূর্ণ করার জন্য দিল্লির একটি প্রকাশনীতে (মুজতাবায়ি প্রকাশনী) কিতাবপত্র শুদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়ে কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত হলেন। সেখানে হজরত নানুতবি রহ.-এর সর্বমোট ওজিফা ছিল দশ টাকা। হঠাৎ একবার এ দশ টাকা গ্রহণ করার ব্যাপারেও তার মনের মাঝে যখন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব করলেন। তখন তিনি

আপন শাইখ হজরত হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর সাথে এই বলে পরামর্শ করলেন যে, এই ওজিফা গ্রহণটাও ছেড়ে দিতে চাই এবং যা-ই খেদমত করব তা আল্লাহর ওয়াস্তে বিনা বেতনেই করতে চাই।

হজরত হাজি সাহেব রহ. তৎকালীন যুগের ইমাম ছিলেন। তিনি তখন বললেন, আপনি মাসিক ওজিফা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। কোনো ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া সে ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার প্রমাণ বহন করে, আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবস্থায় কামাই-রুজির উপকরণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা একটি বাড়তি অস্থিরতার কারণ হয়। উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করা তো শুধু ওই সময় জায়েজ হয়, যখন মানুষ তার অবস্থা ও হালতের কাছে মাগলুব বা পরাজিত হয়ে যায়। হজরত রহ. বলেন, হজরত হাজি সাহেব রহ.-এর তাওয়াক্কুল বা ভরসা ছিল অত্যন্ত উঁচু স্তরের। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কঠিনতম অবস্থা তিনি অতিক্রম করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি মুরিদদের ব্যাপারে সর্বদাই এ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, যাতে তাদেরকে কোনোরূপ অস্থিরতায় নিপতিত হতে না হয়।

ঋণগ্রস্ততার অস্থিরতা ও হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর পরামর্শ

কানপুর মাদরাসার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর হজরত থানবি রহ. সম্পূর্ণ সামানহীনভাবে আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা করে থানাভবনের খানকায় অবস্থান করতে থাকলেন। সে সময় ঘরের টুকিটাকি প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে প্রায় দেড়শ টাকা করজ হলে গেল। তখন হজরত হাজি সাহেব রহ. আর দুনিয়াতে নেই। হজরত হাজি সাহেব রহ.-এর পর হজরত হাকিমুল উম্মত রহ. হজরত গাঙ্গুহি রহ.-কে নিজের শাইখের স্থলাভিষিক্ত মনে করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য তার শরণাপন্ন হতেন। সেমতে তখনকার অবস্থা ও করজ আদায়ের জন্য দুআর দরখাস্তসহ হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর বরাবর চিঠি লিখলেন।

জবাব এলো—দেওবন্দ মাদরাসায় খেদমতের একটি পদ খালি আছে, যদি আপনি সম্মত থাকেন তবে আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে লিখে দিতে পারি। হজরত থানবি রহ. বলেন, এ চিঠি পেয়ে আমি একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। কারণ, এখন যদি আমি দেওবন্দে খেদমতের দায়িত্ব গ্রহণ করি তবে হজরত হাজি সাহেব রহ.-এর কথা রক্ষা করা হয় না। আর যদি এ দায়িত্ব গ্রহণ না করি, তবে হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর সাথে বেয়াদবি হয়। কারণ, তিনি নিজে আগ্রহ করে বিষয়টি আমাকে বলার পরেও তা গ্রহণ না করাটা তো বেয়াদবিই হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক দয়া করে অন্তরে একটা সুন্দর জবাব উদয় করে দিলেন।

আমি হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর পত্রের জবাবে লিখলাম, 'হজরত! আমার পূর্বের পত্রের উদ্দেশ্য ছিল শুধু দুআর আবেদন করা, কোনো চাকুরি বা জীবন ধারণের উপকরণ অন্বেষণ আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ, হজরত হাজি সাহেব রহ. আমাকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন যে, কানপুরের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে আর কখনো কোথাও দায়িত্ব নিয়ো না।

বর্তমানে আমি আপনাকেই হজরত হাজি সাহেব রহ.-এর স্থলাভিষিক্ত বলে মনে করি। সুতরাং এখন এমতাবস্থায় হজরতের হুকুমমতে যদি আমি পুনরায় কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করি তবে সেটাকেও আমি হজরত হাজি সাহেব রহ.-এর হুকুম বলেই ধরে নেব। এবং পূর্বের হুকুমকে রহিত বলে ধরে নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে নেব। এ কথার ওপর হজরত গাঙ্গুহি রহ. জবাব পাঠালেন, 'আপনি এখন আর কোনো চাকুরি বা দায়িত্ব নেবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনার কোনো অস্থিরতাও আর থাকবে না।

আল্লাহর ভয় ও নম্রতার মাহাত্ম্য ও পরামর্শের গুরুত্ব

হজরত থানবি রহ.-এর সম্মানিত পিতা বংশগতভাবে সচ্ছল ও যথেষ্ট প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার উপার্জনের পথও কোনো অবৈধ পথ ছিল না। কিন্তু হজরত থানবি রহ.-এর নজরে কিছু সন্দেহ থাকায় তার পিতা ইন্তেকালের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিজের অংশের বিষয়টি যখন সামনে এলো তখন তিনি তা গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধা-সংকটে পড়ে গেলেন। হজরত থানবি রহ.-এর নিজে নিজে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস ছিল না। তাই তিনি হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর বরাবর চিঠি লিখলেন এবং জানতে চাইলেন, মিরাসি সম্পদের ব্যাপারে আমার কিছু সন্দেহ হওয়ার কারণে মিরাসের অংশ গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা-সংকোচ হচ্ছে। আবার গ্রহণ না করে আমার অংশ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও দ্বিধা হচ্ছে। কারণ, পরবর্তীতে এ কারণে আমি কোনো অস্থিরতায় লিপ্ত হয়ে পড়ি কি না?

হজরত গাঙ্গুহি রহ.-এর পক্ষ থেকে চিঠির উত্তর এলো, 'সম্পদে নিজের অংশ যদি গ্রহণ করা হয় তবে ফতওয়ার দৃষ্টিতে তা জায়েজ, আর যদি তা গ্রহণ না করে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তা তাকওয়া। আর গ্রহণ না করার কারণে ইনশাআল্লাহ কোনোদিন কোনো অস্থিরতার সম্মুখীন হতে হবে না।'

পত্রের এ জবাব পেয়ে হজরত থানবি রহ. তাকওয়ার দিকটিই অবলম্বন করলেন এবং মিরাসে নিজের অংশ ভাইদের জন্য ছেড়ে দিলেন। যা ছিল ধনসম্পদের এক বিরাট অংশ।

অধম (লেখক) শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হজরত গাঙ্গুহি রহ. বলতেন যে, মাওলানা আশরাফ আলি রহ.-এর ন্যূনতম তাকওয়া হলো যে, তিনি তাঁর পিতার মিরাসের অংশ গ্রহণ করেননি।

এ বিষয়টি একদিকে তো তাকওয়া অপরদিকে শুধু নিজের মতের ওপর নির্ভর না করা এবং বুজুর্গানে দীনের পরামর্শের ওপর আমল করার বহুত বড়ো একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ মূলনীতি। যে মূলনীতির অনুসরণ সর্বদা হজরত থানবি রহ. নিজে করেছেন এবং অন্যদেরকেও তা অনুসরণ করার জন্য তাকিদ করেছেন। হজরত থানবি রহ. বলতেন :

'মানুষের কস্মিনকালেও শুধু নিজের মতের ওপর আমল করা উচিত নয়, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে নিজের তুলনায় বড়ো ব্যক্তিবর্গ মওজুদ থাকেন ততক্ষণ তাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করা উচিত। কিন্তু যদি স্বাভাবিক নিয়মে নিজের বড়ো কেউ না থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে সমপর্যায়ভুক্তদের সাথে পরামর্শ করে সেমতে কাজ করতে হবে। যদি নিজের সমপর্যায়ভুক্ত কাউকেও না পাওয়া যায় তবে নিজের তুলনায় ছোটোদের সাথে পরামর্শ করে সেমতে কাজ করবে। হজরত থানবি রহ. আরও বলেন যে, 'স্বাভাবিক নিয়মে বড়ো' কথাটা এ জন্য বললাম, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে কে বড়ো তা তো শুধু আল্লাহ পাকই জানেন।

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা থেকে সৃষ্ট কিছু সন্দেহ ও ভুল ধারণার মূল ভিত্তি

হজরত থানবি রহ. বলেন, প্রচলিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের যত রকম অমূলক ধারণা ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর সেসবের মূলে যে বিষয়টি বুঝে আসে তা হলো, প্রচলিত আধুনিক শিক্ষার দ্বারা মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য ও মহব্বত অন্তর থেকে বিদূরীত হয়ে যায়। যখন এ দুটি বিষয় অন্তরে বিদ্যমান থাকে না তখন ইসলামের প্রতিটি বিধানের ওপর শত শত প্রশ্ন সৃষ্টি হতে থাকে। কারও মাহাত্ম্য ও মহব্বত যদি অন্তরে বিদ্যমান থাকে তবে তার কথা ও বিধি-নিষেধের প্রতি কোনো প্রশ্নই মনে সৃষ্টি হয় না। লক্ষণীয় বিষয় হলো, বর্তমান প্রশাসনের মাহাত্ম্য একরকম জবরদস্তিমূলকভাবেই মানুষের অন্তরে ছেয়ে আছে। এ কারণে তার নির্ধারিত

আইন-কানুনের ব্যাপারে কোনো কারণ বা হেকমত জিজ্ঞাসা করার দিকে কারও লক্ষই যায় না। যেমন : ডাক বিভাগের ফি দেওয়ার ক্ষেত্রে আড়াই তোলা পর্যন্ত দুই পয়সা, আড়াই তোলার ওপরে পাঁচ তোলা পর্যন্ত এক আনা ডাক খরচ দিতে হয়। এই বিধানের ওপর সকলেই ঠিকভাবে আমল করে যাচ্ছে। আলেম-জাহেল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কেউই এর ওপর আমল করা বাদ দেয় না। কারও এ কথাটুকু জিজ্ঞাসা করার মতো সাহসও হয় না যে, এই বিধানের মধ্যে হিকমত বা রহস্য কী? কখনো যদি কেউ কারও কাছে এ ধরনের প্রশ্ন করেও, তবে যাকে প্রশ্ন করা হয় সে প্রশ্নকারীকে এতটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করে যে, 'ভাই, এটা সরকারি আইন', কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এতটুকু জবাব যথেষ্ট মনে করা হয় না যে, 'এটা আল্লাহ পাক অথবা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম।'

এ সবকিছুর কারণ একটাই, আর তা হলো, আল্লাহ পাক ও রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত অন্তর থেকে দূর হয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া।

একজন কলেজ ছাত্রের কাহিনি

সম্ভবত শিমলা নামক অঞ্চলের কোনো কলেজে একবার হজরত থানবি রহ.-এর বয়ান হলো। যার শ্রোতা ছিল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ। সে বয়ানে হজরত থানবি রহ. আধুনিক শিক্ষা দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন সংশয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন; যা ইসলামের মৌলিক ও শাখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মনে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

হজরত থানবি রহ. বলেন, ওইসব সংশয়-সন্দেহ ও প্রশ্নসমূহ সৃষ্টি হওয়ার জন্য শুধু শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যসূচিই দায়ী নয়; বরং এর একটি অন্যতম বড়ো কারণ হচ্ছে, ওসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বদদীনি পরিবেশ। যে পরিবেশের মধ্যে থেকেই আমাদের নবপ্রজন্ম লালিত-পালিত হয়। যার ফলে তাদের অন্তর থেকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই মাহাত্ম্য ও মহব্বত শেষ হয়ে যায়, যা একজন মানুষের ইমানদার হওয়ার জন্য আবশ্যক। আর সে মাহাত্ম্য ও মহব্বত বুজুর্গানে দীনের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যের মাধ্যমে লাভ হতে পারে।

এরপর হজরত থানবি রহ. বলেন, আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে প্রায় সকল জায়গায় কমবেশি বুজুর্গানে দীনের মজলিস হয়ে থাকে। কিছুদিন সে ধরনের

মজলিসে কাটানোর অভ্যাস করুন। তাও সম্ভব না হলে অন্তত বন্ধের সময় হতে কিছু সময় সে কাজের জন্য ব্যয় করুন। যদি আধুনিক শিক্ষিতরা এ কাজটি করেন তবে আমি আশা করি তাদের অন্তর থেকে ইসলামের ওপর সৃষ্টি বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্ন সমূলে বিদূরিত হয়ে যাবে। এবং নিজের মনেই সে প্রশ্নের সঠিক জবাব এসে যাবে এবং সবকিছু এমনিতেই বুঝে এসে যাবে।

সম্ভবত সে মজলিসে উপস্থিতদের মাঝে একজন ছাত্র প্রশ্ন করল, আমরা শুনেছি আপনার নাকি ইংরেজি শিক্ষিতদের প্রতি চরম ঘৃণা রয়েছে? হজরত থানবি রহ. তখন জবাব দিলেন, কস্মিনকালেও না, ওই লোকদের প্রতি আমার কোনো ঘৃণা নেই; তবে তাদের কিছু আচরণ ও কাজ-কর্মের প্রতি আমার ঘৃণা রয়েছে, যেগুলো শরিয়ত-পরিপন্থি। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, সে কাজ-কর্মগুলো কী? হজরত থানবি রহ. জবাব দিলেন, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাজ রয়েছে। সকলের কাজ এক রকম নয়। লোকটি ছিল খুবই আজাদ প্রকৃতির। সে আবারও প্রশ্ন করল, যেমন : আমার মধ্যে কী কী কাজ রয়েছে, যা আপনার দৃষ্টিতে অপছন্দ বা ঘৃণার কারণ। বর্তমানকালের ছাত্রদের অবস্থামতে সে লোকটিরও দাড়ি একেবারে পরিষ্কারভাবে মুণ্ডানো ছিল। হজরত থানবি রহ. বললেন, কিছু কিছু বিষয় তো আপনার মাঝে আছে যা পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত রয়েছে; কিন্তু এত লোকের মজলিসে তা প্রকাশ করতে আমার শরহ হচ্ছে। আর কিছু আছে যা দেখা যায় না, সুতরাং আপনার সামগ্রিক অবস্থা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে না জেনে তার ওপর কোনো মন্তব্য করা তো সম্ভব নয়।

এরপর সে মজলিস শেষ হয়ে গেল। হজরত থানবি রহ. থানাভবন ফিরে এলেন। অতঃপর একবার যখন কলেজ বন্ধ হলো তখন একজন ছাত্রের একটা চিঠি এলো। এ কথা আমার (সংকলক) স্মরণ নেই যে, হজরত রহ.-কে যে ছাত্র প্রশ্ন করেছিল এ চিঠি কি সেই পাঠিয়েছিল, না অন্য (কেউ)। চিঠিতে লেখা ছিল, বর্তমানে আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠন বন্ধ, তাই আমি আপনার বলে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী কিছুদিন আপনার খেদমতে থাকতে চাই। কিন্তু আমার বাহ্যিক আকার-আকৃতি যেমন শরিয়ত মুতাবিক নেই, তেমনই আমার কাজ-কর্ম ও আমলের মাঝেও অনেক গড়বড় রয়েছে। এ অবস্থায় যদি আমাকে আসার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় তবে অবশ্যই আমি উপস্থিত হয়ে যাব।

হজরত থানবি রহ. এ চিঠির জবাবে লিখলেন, যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায়ই চলে আসুন। অন্য কোনো চিন্তা করবেন না। জবাব পেয়ে সে ছাত্র হজরত থানবি রহ.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেল। এবং বলল, আমার অনেক সংশয়

ও প্রশ্ন আছে, বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই। হজরত থানবি রহ. তার এ কথার জবাবে বললেন, হাঁ, বিষয়গুলো ঠিকই জেনে নেওয়া দরকার, তবে সে জন্য পদ্ধতি হবে এই যে, আপনার যতগুলো সংশয় ও প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো সব একত্রে লিখে নিতে হবে। এরপর আপনি আমার মজলিসে বসে নিশ্চুপভাবে আমার কথা শুনতে থাকবেন। কোনো প্রশ্ন করবেন না। এরপর আপনার এখান থেকে বিদায় নেওয়ার যখন তিন দিন বাকি থাকবে তখন আপনি আপনার প্রশ্নের বিষয়টি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, আমি আপনাকে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেওয়ার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সময় দেব। হজরত থানবি রহ. তাকে এ কথাও বলে দিলেন যে, এখন আপনি যে প্রশ্নগুলো লিখে আপনার কাছে রাখবেন, আমার এখানে অবস্থানকালীন এমনিতেই যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যান বা বিষয়টি যদি আপনার বুঝে এসে যায়, তবে সে প্রশ্নটি ওই তালিকা থেকে কেটে দেবেন।

হজরত থানবি রহ.-এর কথামতো ছাত্রটি সেভাবেই সবকিছু করল। এরপর বিদায়ের তিন দিন পূর্বে হজরত থানবি রহ. যখন তাকে প্রশ্ন করার সময় দিলেন তখন ওই ছাত্রটি হজরত থানবি রহ.-কে জানাল যে, আমার প্রশ্নসমূহের তালিকা অনেক দীর্ঘ ছিল, কিন্তু হজরতের দরবারে অবস্থানকালীন বিভিন্ন মজলিসে হজরতের বয়ান ও বক্তব্য শুনে শুনে তার মধ্যকার অনেক প্রশ্নের জবাব আমি এমনিতেই পেয়ে গেছি। যখন যে প্রশ্নের জবাব বুঝতে পেরেছি তখন সেটা কেটে দিয়েছি। এভাবে কাটতে কাটতে এখন মাত্র অল্প কয়েকটা প্রশ্ন বাকি আছে। সে হজরত থানবি রহ.-এর খেদমতে সে প্রশ্নগুলো পেশ করল এবং খুব সহজভাবেই হজরত থানবি রহ. তাকে তার উত্তর বুঝিয়ে দিলেন। এবং লোকটি তার প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলো।

অপর এক ছাত্রের ঘটনা

সম্ভবত আলিগড়ের একজন ছাত্র হজরত থানবি রহ.-এর বরাবরে পত্র লিখল যে, আমি আপনার খেদমতে হাজির হতে চাই, কিন্তু আমার সুরত এবং লেবাস-পোশাক ইত্যাদি সবই শরিয়ত পরিপন্থি। এ ছাড়া আমার আমল তো শরিয়তের খেলাফ আছেই। আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি আপনার দরবারে আসতে চাই।

ছাত্রটির এ পত্রের জবাবে হজরত থানবি রহ. তাকে জানালেন, আপনার চিঠি গেয়ে জানলাম যে, আমলের বিবেচনায় আপনার জাহির বা বাহ্যিক অবস্থা খারাপ। আর আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা জানি যে, আমার বাতেন বা ভেতরগত হালত খারাপ, সুতরাং আমাদের দুজনের রোগই ভিন্ন। যদি আমাদের উভয়ের রোগ একই রকম হতো তবে আমরা মিলতে পারতাম, সুতরাং এমতাবস্থায় আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমি উচিত মনে করি না।

এ দুটি ঘটনাই হজরত থানবি রহ. নিজেই আমাদেরকে শোনালেন এবং বললেন যে, প্রথম ছাত্রের চিঠি পাওয়ার পর আল্লাহ পাক আমার মনে এমন একটি খেয়াল ও ভাব সৃষ্টি করে দিলেন, যা থেকে আমার মনে হলো, এ লোকটি আমার কাছে এলে সে উপকৃত হবে এবং আশা করা যায় যে, তার মধ্যে সংশোধনী আসবে, তাই তাকে আসার অনুমতি দিয়েছি। আর দ্বিতীয় ছাত্রের চিঠি পাওয়ার পর মনে খেয়াল হলো যে, এখানে আসলে লোকটির কোনো ফায়দা বা উপকার হবে এমনটি আশা করা যায় না, এ জন্য তাকে নিষেধ করে দিয়েছি। তবে এখানে এ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ করা ও স্মরণ রাখার মতো যে, লোকটিকে হজরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর দরবারে আসতে নিষেধ করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি এবং ধারা তিনি অবলম্বন করেছেন সেখানে ওই লোকটির সম্মানের প্রতিও লক্ষ রাখা হয়েছে। যাতে তার মন না ভাঙে এবং তার প্রতি যাতে কোনো দোষারোপ করা না হয়। সাথে সাথে নিজের নফসেরও কিছুটা ইসলাহের দিক এতে নিহিত রয়েছে। কারণ, এখানে নিজের খুব পবিত্রতা বা নিজে খুব নেককার হওয়ার দাবিও করা হয়নি। হজরত থানবি রহ.-এর প্রায় কথাতেই এ ধরনের সূক্ষ্ম দিকগুলোকে লক্ষ রাখার বিষয়টি পরিলক্ষিত হতো, যা সকলের পক্ষে সহজ নয়।

আল্লামা শিবলি নুমানি রহ.-এর কথা

হজরত থানবি রহ. বলেন, হজরত উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. যখন দিল্লিতে 'নিজারাতুল মাআরিফ' নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তিনি একবার থানাভবন এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আল্লামা শিবলি নুমানির সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং তার সাথে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের পথভ্রষ্টতা, তাদের অস্থিরতা এবং বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত হয়ে পড়ার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আমি (মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি) তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, আপনার দৃষ্টিতে জাতির ইসলাহ বা সংশোধনের উপায় কী?

আল্লামা শিবলি নুমানি জবাবে বললেন, জাতির সংশোধন শুধু তারাই করতে পারেন জাতির ওপর যাদের পরিপূর্ণ প্রভাব রয়েছে এবং যাদের প্রতি জাতির প্রতিটি নাগরিকের শ্রদ্ধা বিদ্যমান আছে। আর এই প্রভাব এবং শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করা নিজের মধ্যে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা ছাড়া সম্ভব নয়। আর এ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা তাকওয়া, অধিক পরিমাণে ইবাদত এবং আল্লাহর জিকির ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না।

হজরত জুনাইদ বাগদাদি রহ.-এর ঘটনা

একবার হজরত জুনাইদ বাগদাদি রহ. দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তিকে শূলীর ওপর চড়ানো হয়েছে। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কী অপরাধ করেছে? লোকেরা জবাব দিলো, এ ব্যক্তি ডাকাত। প্রথমবার চুরি করার পর সে অপরাধে তার ডান হাত কাটা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও সে চুরি করা থেকে বিরত হয়নি। ফলে পুনরায় চুরি করে ধরা পড়ায় তার বাম পা কেটে দেওয়া হয়েছে। এর পরও যখন সে চুরি করা থেকে বিরত হয়নি; বরং পুনরায় চুরি করে ধরা পড়েছে, সুতরাং এবার নিয়মমতে তার শূলীতে চড়ার পালা, তাই তাকে শূলীতে চড়ানো হয়েছে।

এ কথা শুনে হজরত জুনাইদ রহ. সামনে বাড়লেন এবং তার পা নিজের চোখের সাথে লাগিয়ে চুমু খেলেন। এ দৃশ্য দেখে লোকেরা অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হজরত, আপনি এ কী করছেন? হজরত জুনাইদ রহ. তখন জবাব দিলেন যে, আমি তার পা চুম্বন করিনি, বরং তার অবিচলতা ও দৃঢ়তাকেই চুম্বন করেছি, যা তার অভ্যন্তরে রয়েছে। যদিও এ অজ্ঞ লোকটি তার সে দৃঢ়তাকে অপরাধ ও গুনাহের কাজে ব্যয় করেছে এবং সেমতে সে শাস্তিও পেয়ে গেছে; কিন্তু আমি চিন্তা করছি যে, কতই-না সুন্দর হতো যদি ভালো ও সওয়াবের কাজে আমারও এ ধরনের দৃঢ়তা ও অবিচলতা নসিব হতো।

সুবহানাল্লাহ! ওই সকল বুজুর্গানে দীনের দৃষ্টি কত গভীর ছিল। যার ফলে তারা প্রত্যেক বিষয়ের সীমা সর্বাবস্থায় জানতে পারতেন। যার সারকথা এই দাঁড়ায় যে, মানুষের অভ্যন্তরে যেসব যোগ্যতা ও চাহিদা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটাই যোগ্যতা হিসেবে প্রশংসনীয় হলেও

তাকে অন্যায় পথে কিংবা অপরাধ বা গুনাহের কাজে ব্যবহার করা হলে তা গুনাহের কারণ হয়ে যায়। ঠিক সে যোগ্যতাকেই যদি ভালো কাজে এবং ভালো পথে ব্যবহার করা হয়, তবে তা মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির মাধ্যম হতে পারে। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক রাদি.-এর একটি কথার দ্বারাও এ কথার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্পদের দ্বারা আত্মশুদ্ধি

হজরত থানবি রহ. ইরশাদ করেন, আমার বিশেষ দোস্তগণের একজন তার মধ্যকার কিছু খারাপ অভ্যাস দমন করার জন্য বারবার চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হলেন তখন তিনি বিরক্ত হয়ে প্রবৃত্তির প্রতি শাস্তি হিসেবে প্রতি মাসে একটা বড়ো অঙ্ক সাদকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এ কথাটি যখন আমি জানতে পারলাম তখন আমি তাকে এমনটি করতে নিষেধ করলাম। বললাম, আপনার একটি পয়সাও খরচ করার অনুমতি নেই। কারণ, আমি জানতাম সে যদি এভাবে সাদকা করতে থাকে তবে সে বড়ো সমস্যায় পড়ে যাবে এবং স্ত্রী-পুত্রের যেসব হক তার দায়িত্বে রয়েছে তাদের সেসব দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে শিথিলতা এসে যাবে।[৭]

একটি উপদেশমূলক ঘটনা

হজরত থানবি রহ. বলেন যে, আমাদের এক মামু যিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী একজন দরবেশ ছিলেন। তিনি ১৮৫৭ সালের আজাদি আন্দোলনের সময়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হলো নিম্নরূপ :

এক জায়গায় অনেকগুলো লাশ পড়ে ছিল। লোভী প্রকৃতির এক হিন্দু লোক (বানিয়া) দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। ওই লাশগুলোর মধ্যে একজন লোক আহত হয়ে মরার মতো পড়ে ছিল। সে ওই হিন্দু লোকটিকে দেখে বলল, ওহে ভাই, একটু এখানে এসো! লোকটি এ কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল মরা লাশ আমাকে ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ভেগে পালাতে উদ্যত হলো। ইতিমধ্যে সে আহত লোকটি আবার বলে উঠল, ওহে ভাই, তুমি ভয়

---

[৭]. ২৬ শে রবি. সানি, ১৩৫৯ হি.।

গেয়ো না, আমি মরা লাশ নই, আহত হয়েছি মাত্র। আমার তো আর বাঁচার কোনো আশা নেই। আমার কোমরে বাঁধা থলের মধ্যে অনেকগুলো টাকা আছে। আমার ইচ্ছা হলো, এ টাকা তো আমার কোনো কাজে আসবে না; কারণ, আমি তো কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যাব। সুতরাং টাকাগুলো তোমাকে দিয়ে দেবো। তুমি এগুলো কাজে লাগাতে পারবে।

টাকার কথা শুনে লোকটি গলে গেল এবং ভয়ে ভয়ে সে ওই আহত লোকটির কাছে গেল। সে যখন আহত লোকটির কাছে এসে গেল তখন আহত লোকটি দ্রুত তরবারি হাতে নিয়ে এক আঘাতে ওই লোকটির একটা ঠ্যাং কেটে ফেলল। সাথে সাথে লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু মাটিতে পড়েও লোকটি ওই আহত লোকটির কোমর হাতাতে লাগল। তার ইচ্ছা হলো, টাকাগুলো তো আগে হাতে নিয়ে নিই। এবার আহত লোকটি বলল, আরে মশাই, তুমি তো দেখছি একটা বদ্ধ পাগল, যুদ্ধের ময়দানে কি কেউ কোমরে টাকা বেঁধে নিয়ে আসে!

আসল কথা হলো, আমার আশেপাশে যারা পড়ে আছে তারা সবাই মরা লাশ, আমিই শুধু একা জীবিত আছি, রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, যদি আলাপ-আলোচনা করার জন্য একজন লোক আমার সাথে থাকত তবে রাতটা কাটানো অনেক সহজ হয়ে যেত। আমি যদি তোমাকে এমনিতেই বলতাম যে, ভাই আমার সাথে তুমি রাতে এখানে থাকো, তাহলে তুমি তো ধেয়ে কুল পেতে না। আমি একটু মানসিক প্রশান্তির জন্য তোমাকে আমার সাথি বানিয়ে নিলাম। হিন্দু লোকটি রেগে কটমটিয়ে বলল, বেটা বজ্জাত কোথাকার! নিজেও চলতে পারবে না, অন্যকেও চলতে দেবে না।

মামুজান এ ঘটনার বর্ণনা করে বললেন, বর্তমানে আল্লাহ পাকের রাস্তার ব্যাপারে মানুষের অবস্থা এরূপই হয়ে গেছে যে, সে নিজে তো আল্লাহর পথে চলবেই না, অন্য কেউ চলতে চাইলে তার পথেও বাধা সৃষ্টি করে দেবে।

পূর্ববর্তী মাশাইখগণের প্রতি আদব

হজরত থানবি রহ. বলেন যে, ইলমি তাহকিক এবং গবেষণার চাইতে বেশি প্রয়োজন হলো আদব। বরং বুজুর্গানে দীনের প্রতি আদব রক্ষা করে চলার দ্বারা মহান আল্লাহ তাআলা ইলমি ব্যাপারে তাহকিক ও গবেষণা করার যোগ্যতা দিয়ে

দেন। পূর্বসূরি বুজুর্গানে দীনের প্রতি আদব ও শিষ্টাচার পরিহার করে যে গবেষণা করা হয়, সেখানে ভ্রষ্টতা ও পদস্খলনের সমূহ আশঙ্কা বিরাজমান থাকে।

শাহ ইসহাক সাহেব রহ.-এর একটি আশ্চর্য ঘটনা

হজরত আমির শাহ খান সাহেব রহ.—যিনি হজরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবি রহ.-এর বিশেষ ও খাস মুরিদ ছিলেন—তিনি দিল্লির বুজুর্গানে দীনের ঘটনাবলি সনদসহ বর্ণনা করতেন। তিনি বলেছেন যে, হজরত শাহ ইসহাক সাহেব রহ. নিজ বংশে মেধাবী নয় বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ, সে বংশ ছিল সব বড়ো বড়ো উলামায়ে কেরামের বংশ। একজনের থেকে আরেকজন বড়ো ছিলেন। যদিও সেই বুজুর্গের—যিনি ওই বংশের মেধাবী নয় বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন—তার একটি ঘটনা শুনলে বড়োই আশ্চর্য হতে হয়। ঘটনাটি হলো :

একদিন একজন তালিবে ইলমকে অস্থির অবস্থায় দেখে শাহ সাহেব তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু প্রথমে সে অহংকারীসুলভ ভঙ্গীতে চোখ ও ঠোঁট দিয়ে একটু ইশারা করে বোঝাল যে, কিছুই হয়নি। এরপর তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'শামসে বাজেগাঁ' (দর্শন শাস্ত্রের দরসি কিতাব)-এর একটি জায়গা বুঝে আসছে না। এবং সে ব্যাপারে আমার উস্তাদের সাথে আমার মতবিরোধ হয়ে গেছে। তিন দিন যাবৎ আমি সেটা নিয়েই আটকে আছি।

হজরত শাহ সাহেব স্নেহ ও শফকতের দৃষ্টিতে বললেন, জায়গাটি আমাকে একটু দেখাও না। ওই তালিবে ইলম ভাবল, ইনি হলেন একজন মুহাদ্দিস। তিনি ইলমে হাদিসের ব্যাপারে হয়তো অভিজ্ঞ হবেন। দর্শনের কিতাবের সাথে তার সম্পর্কই-বা কী আছে। এই ভেবে সে অত্যন্ত অনীহা ও অনাগ্রহ সহকারে কিতাবখানা শুধু তার সামনে রেখে দিলো। হজরত শাহ সাহেব রহ. সে জায়গাটি মুতালাআ করে তার এমন পরিষ্কার মর্ম বয়ান করে দিলেন যার ফলে যে তালিবে ইলমের সংশয় দূরীভূত হয়ে গেল।

এবার এই তালিবে ইলম তো হজরত শাহ সাহেব রহ.-এর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হজরত শাহ সাহেব তখন বললেন, মিয়া, আমরা সবই পড়েছি, তবে এগুলো (দর্শন ও মানতিক)-কে নিষ্প্রয়োজনীয় ও বেহুদা মনে করে ছেড়ে রেখেছি।

হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. সদা ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন, হয় হাদিস পড়াতেন বা নিজে পড়তেন বা তাসবিহ পাঠ করতেন বা নামাজ পড়তেন; অন্য কিছু নয়

(হাফেজ জাহাবি রহ. বলেন, তিনি ইমাম, মুহাদ্দিস, নাহভি, শায়খুল ইসলাম, যার মৃত্যু ১৬৮ হি.। পাশাপাশি তিনি একজন ফকিহ, সুন্নাতের অনুসারী আবেদ ছিলেন।)

তার ছাত্র আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি রহ. বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামাকে যদি বলা হয় আপনি আগামীকাল মারা যাবেন, তাহলে তিনি তার আমল বাড়াতে পারবেন না। মুসা ইবনে ইসমাইল তাবোজাকি রহ. বলেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, আমি হাম্মাদ ইবনে সালামাকে কখনো হাসতে দেখিনি তাহলে আমি সত্যবাদী হব। তিনি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। হয় হাদিস পড়াতেন অথবা নিজে পড়তেন কিংবা তাসবিহ পড়তেন অথবা নামাজ পড়তেন। তিনি দিনটাকে এভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন। ইউনুস ইবনে মুআদ্দিব রহ. বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা নামাজরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন!

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. মৃত্যুর সময়ও একটি ফিকহি মাসাআলা নিয়ে আলোচনা করেছেন

ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম আনসারি কুফি অতঃপর বাগদাদি (জন্ম : ১১৩ হি., মৃত্যু : ১৮২ হি.) যিনি ফিকাহ ও ইজতিহাদের জগতে ইমাম আবু ইউসুফ নামে পরিচিত। যিনি ইমাম আবু হানিফার শাগরিদ এবং তার ইলম ও মাসলাকের মুখপাত্র। বাদশাহত্রয় মাহদি, হাদি ও হারুন রশিদ আব্বাসির কাজি ছিলেন। যাকে সর্বপ্রধান কাজি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বরং পৃথিবীর প্রথম চিফজাস্টিস উপাধিতে তাকে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি মুমূর্ষ অবস্থায়ও তাকে দেখতে আসা একজনের সাথে ফিকাহর একটি মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হয়তো তাতে কোনো ইলম পিপাসুর পরিতৃপ্তি হওয়ার উপকরণ তৈরি হবে। এবং জীবনের শেষ মুহূর্তটাও যেন ইলমি আলোচনা ও ইফাদা-ইস্তিফাদা থেকে শূন্য না থাকে।

তার শাগরিদ কাজি ইবরাহিম ইবনে জাররাহ কুফি অতঃপর মিসরি রহ. বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. অসুস্থ ছিলেন। আমি তাকে দেখতে গেলাম। তো

দেখলাম, তিনি অজ্ঞান অবস্থায় আছেন। যখন জ্ঞান ফিরল তিনি আমাকে বললেন, এই মাসআলায় তোমার কী অভিমত? আমি বললাম, হজরত, এই অবস্থাতেও? তিনি বললেন, কোনো সমস্যা নেই। একটু চিন্তাভাবনা করে নিই না? হয়তো এর দ্বারা কারও উপকার হবে। এরপর বললেন, হজের বিধিবিধানে জামারাতের পাথর মারা পায়ে হেঁটে উত্তম না সওয়ার হয়ে করা উত্তম? আমি বললাম, আরোহণ করে করা উত্তম। তিনি বললেন, তুমি ভুল বলছ। অতঃপর আমি বললাম, পায়ে হেঁটে করা উত্তম। তিনি বললেন, এটাও ভুল। আমি বললাম, তাহলে আপনিই বলে দিন, কোনটা সঠিক। তিনি বললেন, যে রমির পরে আরও রমি আছে সেটা পায়ে হেঁটে করা উত্তম। পক্ষান্তরে যে রমির পর আর রমি নেই সেটা আরোহণ করে করা উত্তম। এরপর আমি তার কাছ থেকে উঠে চলে এলাম। দরজার কাছে যেতেই তার ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম কাজি সাহেব তার প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে গেছেন।

লেখক বলেন, এটাই ছিল ওলামা ও মাশায়েখদের নীতি। তারা বলেছেন, দোলনা থেকে সমাধি পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ করো। (কিন্তু এ কথাটা হাদিস নয়। যদিও একটা চরম সত্য কথা। -আব্দুল ফাত্তাহ রহ.)

ইমাম জাহেজ, ফাতাহ ইবনে খাকান ও কাজি ইসমাইল রহ.-এর ইলমস্পৃহা

খতিব বাগদাদি রহ. 'তাকইদুল ইলম' নামক কিতাবে আবু আব্বাস মুবাররাদ রহ.-কে উদ্ধৃত করে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি তিনজন ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি ইলমের সৌখিন পেয়েছি—

১. সাহিত্যিককুল শিরোমণি আমর ইবনে বাহর; যিনি জাহেজ নামে বিখ্যাত। (জন্ম : ১৬৩ হি., মৃত্যু : ২৫৫ হি.)

২. স্ব-যুগের সাহিত্যিক ও কবি, অসাধারণ মেধাবী ও ধীমান ব্যক্তিত্ব, আব্বাসি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের মন্ত্রী ও পালক ভাই এবং বিশাল গ্রন্থাগারের স্বত্বাধিকারী ফাতাহ ইবনে খাকান (মৃত্যু : ২৪৭ হি.)

৩. স্ব-যুগের ইমাম, ফিকহ ও কাজি ইসমাইল ইবনে ইসহাক মালেকি বাগদাদি (জন্ম : ২০০ হি., মৃত্যু : ২৮২ হি.)

জাহেজের অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই কোনো কিতাব তার হস্তগত হতো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলতেন। সেটা যে বিষয়েরই হোক না কেন। এমনকি কিতাব ব্যবসায়ীদের দোকানগুলো ভাড়া নিয়ে নিতেন এবং সারা রাত জেগে সেখানে অধ্যয়ন করতেন।

ফাতাহ ইবনে খাকানের অধ্যয়নের আগ্রহ ছিল এমন যে, তিনি তার থলে বা জামার আস্তিনে কিতাব রাখতেন। যখন কোনো প্রয়োজন বা নামাজের জন্য মুতাওয়াক্কিলের মজলিস থেকে উঠতেন, তখন কিতাব বের করে হাঁটতে হাঁটতে অধ্যয়ন করতেন। যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন সেখান পর্যন্ত এ অবস্থায়ই যেতেন। ফিরে আসার সময়ও নিজ আসনে পৌঁছা পর্যন্ত এ অবস্থা-ই বিরাজ করত। যখন খলিফা মুতাওয়াক্কিল কোনো প্রয়োজনে মজলিস থেকে উঠে যেতেন, তখন খলিফার ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কিতাব অধ্যয়নে রত থাকতেন।

কাজি ইসমাইল ইবনে ইসহাকের অবস্থা ছিল এমন, যখনই আমি তার কাছে গিয়েছি, তার হাতে কিতাব ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি। তাকে অধ্যয়নে তন্ময় থাকতে দেখেছি। অথবা অধ্যয়নের জন্য কোনো কিতাবের খোঁজে ব্যাকুল বা কিতাবগুলোকে ঝাড়তে মুছতে দেখেছি।

ইবনে সুহনোন রহ.-কে তার বাঁদি রাতের খাবার খাইয়ে দিয়েছে, কিন্তু তিনি রচনার ব্যস্ততায় মুগ্ধতার কারণে টের পাননি

কাজি ইয়াজ রহ. রচিত 'তারতিবুল মাদারেক' নামক কিতাবে মালেকি ফকিহ ও যুগের মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে সুহনোন কায়রাওয়ানি রহ.-এর (জন্ম : ২০২ হি., মৃত্যু : ২৫৬ হি.) জীবনী আলোচনায় আছে :

ইবনে সুহনোনের কাছে উম্মে মুদাম নামী জনৈক বাঁদি ছিল। একদিন মুহাম্মদ ইবনে সুহনোন রহ. তার কাছে ছিলেন। সেদিন তিনি অনেক রাত পর্যন্ত কোনো কিতাব রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। খানা এলো, বাঁদি খানা পরিবেশন করার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, এখন আমি ব্যস্ত আছি। অপেক্ষার প্রহর যখন দীর্ঘ হলো বাঁদি নিজ হাতে খাওয়ানো শুরু করল। মুহাম্মদ ইবনে সুহনোন বেখেয়ালে পুরো খানা সাবাড় করলেন। এবং নিজ কাজে তন্ময় থাকলেন। একসময় ফজরের আজান হয়ে গেল। তখন তিনি উম্মে মুদামকে লক্ষ করে বললেন, উম্মে মুদাম! রাতে তোমার খোঁজখবর নিতে পারিনি। যা আছে নিয়ে আসো। সে বলল,

আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে স্বহস্তে খাইয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, তাই নাকি? আমি তো টেরই পাইনি।

পূর্বসূরি আলেমদের রাত্রিজাগরণ ও ইলমের জন্য বিদগ্ধ হওয়ার ঘটনা

কাজি ইয়াজ রহ. 'আল-ইলমা' গ্রন্থে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে লাব্বাদ বলেছেন, ইমাম ও ফকিহ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আব্দোস কায়রোয়ানি—যিনি ইবনুল লাব্বাদ নামে প্রসিদ্ধ—ত্রিশ বছর যাবৎ এশার অযু দ্বারা ফজরের নামাজ পড়েছেন। পনেরো বছর অধ্যয়নের কারণে, আর পনেরো বছর ইবাদতের কারণে।

কুফার বিখ্যাত নাহুবিদ ইমাম সালাব রহ. নব্বই বছর বয়সেও হাঁটতে হাঁটতে কিতাব পড়তেন, ফলে একটি গর্তে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়

(জন্ম : ২০০ হি., মৃত্যু : ২৯২ হি.)

আল্লামা মারজুবানি রহ. বলেন, তার মৃত্যুর কারণ ছিল এই, তিনি জুমুআর দিন আসরের পর জামে মসজিদ থেকে বের হলেন। সাথি-সঙ্গীদের একটি দল তার পিছে পিছে চলল, আর আমিও তাদের একজন। তার শ্রবণশক্তি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, খুব কমই শুনতে পেতেন। তার হাতে কিতাব ছিল। পথ চলাকালীন অধ্যয়নে রত ছিলেন। সহসা একটি ঘোড়ার সাথে টক্কর খেয়ে একটি গর্তে গিয়ে পড়েন। সেখান থেকে উঠানো হলো। কিন্তু তার বোধশক্তি কাজ করছিল না। সুতরাং ওই অবস্থায়ই তাকে বাসায় আনা হয়। মাথাব্যথায় তিনি কাতরাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি আল্লাহর নিকট চলে গেলেন।

ইবনে জারির রহ. এর সময় বাঁচানো ও ত্রিশ হাজার পাতায় তাফসির লেখার ইচ্ছা পোষণ

ইমাম ইবনে জারির তাবারি—যিনি মুফাসসিরিন, মুহাদ্দিসিন ও ঐতিহাসিকদের শিরোমণি, স্ব-যুগের ইমাম ও মস্ত বড়ো মুজতাহিদ ছিলেন, সময়কে ফলপ্রসূকরণে এবং সদা দরস ও তাদরিস, লেখালিখি ও রচনায় নিমগ্ন থাকার দিক থেকে যুগের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন; নতুনত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও পাকাপোক্ততায়

তার রচনাবলির আধিক্য অবাক করার মতো—নিম্নে তার আলোচনা উপস্থাপিত হলো, যা খতিব বাগদাদির 'তারিখে বাগদাদ' ও আল্লামা ইয়াকুত হামাভির 'মুজামুল উবাদা' থেকে গৃহীত।

কাজি আবু উমর ও আবুল কাসেম ওয়াররাক বর্ণনা করেন, ইমাম তাবারি রহ. একদিন নিজ ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোরআনের তাফসির লেখার জন্য প্রস্তুত আছ? ছাত্ররা বলল, কত বড়ো হবে? তিনি বললেন, ত্রিশ হাজার পাতা। এ কথা শোনে ছাত্ররা অবাক হয়ে বলল, তাফসির শেষ করার আগেই তো আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে! তাই তিনি সংক্ষেপ করে তিন হাজার পাতায় তাফসির পূর্ণ করলেন। যা ২৮৩ হি. থেকে ২৯০ হি. পর্যন্ত সাত বছরে শেষ হয়।

ইবনে জারির রহ.-এর ত্রিশ হাজার পাতায় ইতিহাস গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা

এরপর ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি হজরত আদম আ. থেকে আজ পর্যন্ত পুরো বিশ্বের ইতিহাস লেখার জন্য প্রস্তুত আছ? ছাত্ররা বলল, কত মোটা হবে? তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, ত্রিশ হাজার পাতায়। ছাত্ররা হতভম্ব হয়ে আবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করল। ছাত্রদের হতাশাব্যঞ্জক জবাব শোনে ইমাম তাবারি রহ. বললেন, আফসোস! মনোবল শেষ হয়ে গেছে। এরপর সংক্ষেপ করে তাফসিরের কলেবর সমান ইতিহাস লিপিবদ্ধ করান। ২৭ রবিউস সানি ৩০৩ হি. তারিখ রোজ বুধবার এই মহান কিতাব লিখে শেষ করেন।

ইবনে জারির রহ. দৈনিক চল্লিশ পাতা লিখতেন

খতিব বাগদাদি রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ সিমসিমি বলেন, ইবনে জারির চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিত দৈনিক ৪০ পাতা লিখতেন। তার শিষ্য আবু মুহাম্মদ ফারগানি রহ. বলেন, ইমাম ইবনে জারিরের ছাত্ররা তার সাবালক হওয়ার সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের হিসাব করে তার রচনাগুলোকে ভাগ করেছে। তাতে দেখা গেল গড়ে প্রতিদিন ১৪ পাতা হয়। এটা এমন এক বিষয় যা আল্লাহর বিশেষ তাওফিক ছাড়া কারও পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর কী কারিশমা! অনেকের মনোবল কত উন্নত হয়!

ইবনে জারির রহ. সর্বমোট ৩৫৮ হাজার পাতা লিখে গেছেন

ইমাম ইবনে জারির রহ. ২২৪ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৩১০ হি. সনে ইন্তেকাল করেন। এ হিসেবে তার মোট বয়স ৮৬ বছর হয়। যদি আমরা তার সাবালক হওয়ার সময়ের আগের বয়সটা বাদ দিই—যা সাধারণ অনুমান মতে ১৪ বছর হয়—তাহলে যেন তিনি ৭২ বছর যাবৎ দৈনিক ১৪ পাতা লিখেছেন। এখন যদি ৭২ বছরের দিনগুলো গণনা করে দৈনিক ১৪ পাতার হিসাব করা হয়, তাহলে তার লেখা পাতার মোট সংখ্যা হবে ৩৫৮ হাজার।

ইতিহাস ও তাফসির প্রত্যেকটার পাতা প্রায় তিন হাজার। ইতিহাসটি এগারো খণ্ডে ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। আর তাফসিরটি বড়ো সাইজের ত্রিশ খণ্ডে ছেপেছে, যার প্রতিটি অংশ এক ভলিউমের সমান। এখন তার অন্যান্য রচনাগুলোর পাতাগুলো হিসাব করে দেখুন, সেগুলোর সংখ্যা ৩৫১ হাজার হয়। তাহলে অনুমান করতে পারবেন এই মহান ইমামের সর্বমোট রচনা কী পরিমাণ হবে? যেগুলোর অবস্থান বিদ্যার দিক থেকে একটি 'বহুমুখী একাডেমি' আর আধিক্যের দিক থেকে একটি বৃহৎ প্রকাশনালয়ের চেয়ে কম ছিল না। তিনি একা একজন ব্যক্তি ছিলেন। নিজেই লিখতেন বা লেখাতেন এবং মানুষের সামনে নিজ ইলম ও চিন্তার সারনির্যাস পেশ করতেন। চিন্তা করুন! এই বিশাল কৃতিত্ব কী করে সম্ভব হতো, যদি তিনি তার সময়ের হেফাজত না করতেন। এবং সদা নিজেকে রচনা ও গ্রন্থনার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সুপ্রচেষ্টা না করতেন।

ইবনে জারির রহ.-এর সময় ও কর্মের বিন্যাস

ইবনে জারির রহ.-এর ছাত্র ও শিষ্য কাজি আবু বকর ইবনে কামেল রহ., ইবনে জারির রহ.-এর সময় ও কর্মের বিন্যাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

তিনি খাদ্য গ্রহণের পর 'খায়শ' নামক কাতানের কাপড়ে যা ঠান্ডা হওয়ার কারণে গরমের মৌসুমে ঘুমের সময় পরিধান করা হয়, গোলাপজল ও সন্দলের রঙ্গে রঞ্জিত হাফ হাতা জামা গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন।

এরপর ঘুম থেকে উঠে ঘরে জোহরের নামাজ পড়তেন। এরপর আসর পর্যন্ত লিখতেন। এরপর বাইরে গিয়ে আসরের নামাজ পড়তেন। এরপর মাগরিব পর্যন্ত পড়াতেন ও তার সামনের পড়া হতো। এরপর ফিকাহ পাঠদানের জন্য বসতেন

এশা পর্যন্ত। এরপর ঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি আল্লাহর তাওফিক অনুসারে তার রাত-দিনকে নিজের, দীনের সৃষ্টির কল্যাণের জন্য ভাগ করে রেখেছিলেন।

মৃত্যুর মাত্র এক মুহূর্ত পূর্বে ইবনে জারির রহ. একটি দুআ লিখেছেন

বিখ্যাত লেখক মুহাম্মদ কুরদ আলি রহ. 'কুনুজুল আজদাদ' নামক কিতাবে ইবনে জারির তাবারি রহ.-এর জীবনী আলোচনায় বলেছেন, তিনি তার জীবনের কোনো একটি মুহূর্ত অযথা নষ্ট করেছেন বলে বর্ণিত নেই। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি হয়তো উপকৃত হয়েছেন বা উপকৃত করেছেন। মাআফি ইবনে জাকারিয়া রহ. নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু জাফর তাবারির মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার কাছে ছিলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা গেছেন। এই সময় তার সামনে জাফর ইবনে মুহাম্মদ রহ. হতে একটি দোয়া উল্লেখ করা হলো। সাথে সাথে তিনি দোয়াত ও কালি আনতে বললেন এবং দুআটি লিখে নিলেন। তাকে বলা হলো, এমতাবস্থায়ও লিখতে হয়? জবাবে তিনি বললেন, মানুষের উচিত আমৃত্যু ইলম অর্জন করা। আল্লাহ তায়ালা তাকে রহম করুন, ইলম, দীন, ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

লিখিত কিতাবাদি ও স্বীয় অক্ষয় কীর্তিসমূহের মাধ্যমে ইবনে জারির রহ. অমর হয়ে আছেন

ইবনে জারির রহ.-এর লিখিত কিতাবাদির পূর্বোক্ত তালিকাটি তার রচনাবলির প্রতি সামান্য ইঙ্গিত মাত্র। সেখানে তার সবগুলো কিতাবের নাম ও বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। তার কয়েকটি কিতাব অমরত্ব লাভে ধন্য হয়েছে। এগুলো তাকে স্মরণীয় করে রাখবে সন্তান ও বংশধরের চেয়েও অধিক, যদিও তাদের সংখ্যা দশ, বিশ বা ত্রিশ হয়। কারণ, তারা তো অল্পদিনের মধ্যেই বিলুপ্তির আধারে হারিয়ে যাবে। বিস্মৃতির ও অবহেলার ভাঁজে ভাঁজে প্রবিষ্ট হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু তার রচনাগুলো যুগ যুগ ধরে অক্ষয় হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুর পর প্রায় এগারোশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তার রচনাগুলো আজও অম্লান হয়ে আছে। যতদিন পর্যন্ত দিন-রাতের আবর্তন অব্যাহত থাকবে, ততদিন তার রচনাগুলো চির অক্ষয় হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইমাম ইবনুল জাওজি রহ. সত্যিই বলেছেন, আলেমের কিতাবই তার অমর সন্তান।

ইসলামি গ্রন্থভান্ডার সমৃদ্ধকরণে হাফেজ ইবনে আসাকের রহ.-এর বিশাল অবদান

হাফেজ ইবনে আসাকের রহ. আবুল কাসেম দামেশকি আলি ইবনে হাসান রহ., (জন্ম : ৪৯৯ হিজরি, মৃত্যু : ৫৭১ হিজরি) তিনি নিজ সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত হেফাজত করতেন। তিনি ইসলামি গ্রন্থাগারকে এমন সব পুস্তকাদি সরবরাহ করে গেছেন, যা আজকালকার একাডেমিগুলো ছাপতেও সক্ষম হবে না, লিখবে তো দূরের কথা। অথচ এগুলো তিনি একা লিখেছেন। নিজ হাতে নিজ কলমে লিখেছেন। সেগুলোকে পরিশীলিত করেছেন। মূল কিতাবগুলো একত্রিত করে তা থেকে নির্বাচন করেছেন। বিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন। এগুলো যেন বিস্ময়কর রচনাধিক্য ও লেখনীর সক্ষমতায় তার দৃঢ়চেতনা, জ্ঞানের বিশালতা ও মুখস্থশক্তির বিস্তৃতিতে তার যুগের বিস্ময় হওয়ার জীবন্ত অবাক প্রতীক। এখানে আমি তিনটি কিতাব থেকে তার জীবনীর একটি দিক সংক্ষেপে তুলে ধরব। তা হলো ইলমের জন্য তার সফরাধিক্য, রচনাবলির পর্যাপ্ততা ও সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত হেফাজত করা-সংক্রান্ত দিকটি।

(১) বিখ্যাত ইতিহাসবিদ কাজি ইবনে খাল্লিকান রহ. 'ওফায়াতুল আয়ান' নামক কিতাবে তার জীবনী আলোচনায় বলেছেন, তিনি স্ব-যুগের শামের মুহাদ্দিস ছিলেন। শাফেয়ি ফুকাহাদের অন্যতম বিশেষ ফকিহ ছিলেন। হাদিস চর্চাই তার জীবনের বড়ো ব্যস্ততা ছিল। তাই মুহাদ্দিস হিসেবেই তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি হাদিস অন্বেষণে প্রচুর মেহনত করেছেন। ফলে এমন সব হাদিস সংগ্রহ করেছেন যা অন্যরা করতে পারেনি। তিনি দেশ-বিদেশ সফর করেছেন। বহু মাশায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি হাফেজ আবু সাদ আব্দুল করিম ইবনে সামআনি রহ.-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে সামআনি রহ.-এর শায়খদের সংখ্যা—যাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন—সাত হাজার ছিল।

তিনি অত্যন্ত দীনদার হাফেজ ছিলেন। সনদ ও মতন উভয়টাই আয়ত্ত করেছেন। তিনি বাগদাদে হাদিস শুনেছেন। এরপর দামেশকে ফিরে এসেছেন। তারপর খুরাসান সফরে গিয়েছেন। নিশাপুর, হারাত, আসবাহান ও পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদি রচনা করেছেন। বহু তাখরিজ করেছেন। হাদিস সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করতে পারতেন। সংকলন তৈরিতে আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। আশি খণ্ডে তারিখে দামেশক লিখেছেন। বিস্ময়কর তথ্যাবলি সেথায় সন্নিবেশিত করেছেন। এটা খতিব বাগদাদি রহ.-এর তারিখে

বাগদাদের আদলে লেখা। কিন্তু কলেবরে ও অভিনব বিষয়াদিতে এর চেয়ে হাজার গুণ বড়ো।

আমাকে আমার শায়খ মিশরের হাফেজ আল্লামা জাকিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ আব্দুল আজিম মুনজিরি রহ. উক্ত ইতিহাস গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি একটি খণ্ড বের করে অনেকক্ষণ যাবৎ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি বোঝমান হওয়ার সময় থেকেই ইতিহাস গ্রন্থটি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে সময় থেকেই সংকলন শুরু করেছেন। অন্যথায় পাঠদান ও মানুষের ভিড়ের পাশাপাশি এ ধরনের কিতাব সারা জীবনেও লেখা সম্ভব নয়।

তিনি সত্যই বলেছেন, যারা তাকে চিনে তারা এ কথার সত্যতা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবে। মানুষ এত সময় কোথায় পাবে যে এত বড়ো কিতাব লিখবে, অথচ উক্ত ইতিহাসটি তিনি নিজেই লিখেছেন। নিজেই কত পাণ্ডুলিপি তৈরি করে কারেকশন করে কিতাবটি প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া তার আরও সুন্দর ও উপভোগ্য কিতাব রয়েছে।

আল্লামা ইবনে আসাকের রহ.-এর গ্রন্থাবলির সংখ্যা পঞ্চাশের ওপরে। তন্মধ্যে একটা হলো তারিখে দামেশক যা আশি খণ্ডে সমাপ্ত।

ইবনে আসাকের রহ.-এর গগণচুম্বী মনোবল ও মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ

২. হাফেজ জাহাবি রহ. 'তাজকিরাতুল হুফফাজ' গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনায় বলেছেন, তিনি হলেন মহান হাফেজ, শামের মুহাদ্দিস, ইমামদের গর্ব, আবুল কাসেম ইবনে আসাকের রহ., বহু গ্রন্থ ও বিশাল তারিখের লেখক। তিনি ৪৯৯ হিজরি সনের শুরুতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ও ভাই ইমাম জিয়াউদ্দিন হেবাতুল্লাহ রহ.-এর উদ্যোগে ৫০৫ হিজরি সনে তিনি হাদিস শ্রবণ করেন। বাগদাদ, মক্কা, কুফা, নিশাপুর, আসবাহান, মারু, হারাত ইত্যাদি শহরে তিনি হাদিস শ্রবণ করেছেন। তিনি 'আল-আরবাইনাল বুলদানিয়্যা' কিতাব লেখেন, তাতে চল্লিশটি শহরের চল্লিশজন শায়খ থেকে চল্লিশটি হাদিস লিখেছেন। তার শায়খের সংখ্যা তেরোশ। তার মাস্তুরাত শায়খার সংখ্যা আশির ঊর্ধ্বে।

প্রচুর ছাত্র তার কাছে হাদিস শুনেছে। যাদের মধ্যে তার সফরসঙ্গী আবু সাদ সামআনি রহ.-ও রয়েছেন। এরপর জাহাবি রহ. তার রচনার সংখ্যা পঞ্চাশটি উল্লেখ করেছেন। তিনি ইলম শিক্ষাদানের জন্য চারশ আশিটি বৈঠকে ইলম লিখিয়েছেন। প্রতিটি বৈঠক একটি কিতাবের সমতুল্য।

তার ছেলে মুহাদ্দিস বাহাউদ্দিন কাসেম রহ. বলেছেন, আমার আব্বা জামাত ও তিলাওয়াতের নিয়মিত পাবন্দ ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে এক খতম দিতেন। রমজান মাসে প্রতিদিন একবার খতম করতেন। দামেশকের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারায় এতেকাফ করতেন। তিনি অনেক বেশি নফল ও জিকির করতেন। শবে বরাত ও দুই ইদের রাতে জাগ্রত থেকে নামাজ ও জিকির করতেন। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত যেন নষ্ট না হয় নিজেকে সদা সজাগ রাখতেন। চল্লিশ বছর যাবৎ সংকলন ও পাঠদান ছাড়া অন্য কোনো কাজ করেননি। এমনকি আনন্দ-ভ্রমণ ও একান্তবাসের সময়ও লিখতেন।

হাফেজ আবুল আলা হামাজানি রহ. বলেছেন, প্রথম মেধা ও নিখাদ অনুধাবনশক্তির কারণে আবুল কাসেম ইবনে আসাকের রহ.-কে বাগদাদে 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' বলা হতো। আবুল মাওয়াহেব ইবনে সাসরা রহ. বলেন, আমি তাকে বললাম, জনাব কি নিজের মতো কাউকে দেখেছেন? জবাবে তিনি বললেন, এমনটা বলো না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না।' আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমার রবের নিয়ামতরাজি বর্ণনা করো।' তখন তিনি বললেন, কেউ যদি বলে আমার দুচোখ আমার মতো কাউকে দেখেনি, তাহলে সত্যবাদী হবে।

এরপর আবুল মাওয়াহেব রহ. বলেন, আমি বলছি আমি তার মতো কাউকে দেখিনি। তার গুণাবলির মতো গুণাবলি কারও মধ্যে একত্রিত হয়েছে—তাও দেখিনি। তিনি চল্লিশ বছর যাবৎ একই নিয়মে জীবনযাপন করেছেন। সদা প্রথম কাতারে জামাতের সাথে নামাজ পড়তেন। বিনা ওজরে তা তরক করতেন না। রমজান মাস ও জিলহজের প্রথম দশকে এতেকাফ করতেন। সম্পদ উপার্জন ও বাড়ি বানানোর প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। ইমামত ও খেতাবতের পদ গ্রহণ করেননি। তার কাছে পেশ করার পরও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে তিনি ভয় পেতেন না।

ইবনে আসাকের রহ.-এর ইলমের জন্য একাগ্রতা, তার শায়খ ও শায়খার আধিক্যতা, এবং তার আয়ত্তশক্তি

৩. ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি রহ. 'তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাতিল কুবরা' নামক গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনায় বলেছেন, তিনি ছিলেন মহান ইমাম, উম্মতের হাফেজ,

আবুল কাসেম ইবনে আসাকের রহ.। তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কারও নাম আসাকের ছিল কি না আমার জানা নেই। কিন্তু তিনি এ নামেই বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি সুন্নাহর সমর্থক ও খাদেম ছিলেন। স্ব-যুগের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। বিদগ্ধ হাফেজে হাদিসদের সর্বশেষ মনীষী ছিলেন। বিদ্যান্বেষীদের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ইলমে পারদর্শী ছিলেন। ইলম ও আমল ছাড়া তার কোনো সঙ্গী ছিল না। এ দুটোই ছিল তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি চরম হিফজশক্তির অধিকারী ছিলেন। নতুন পুরাতন সবকিছুই তার কাছে বরাবর ছিল। আয়ত্তশক্তিতে পূর্বসূরিদেরকে ছাড়িয়ে না গেলেও সমান সমান ছিলেন। তিনি বিদ্যাকুবের ছিলেন, আর সকল আলেম তার সামনে ভিখারির মতো ছিল।

তিনি অনেক মুহাদ্দিসের নিকট হাদিস শুনছেন। তার শায়খের সংখ্যা এক হাজার তেরোশ। মাস্তুরাত শায়খার সংখ্যা আশির ওপরে। সফর করেছেন ইরাক, মক্কা, মদিনা। অনারব শহরগুলোতেও তিনি সফর করেছেন। অতপর আসবাহান, নিশাপুর, মারু, তিবরিজ, মিহানা, বায়হাক, খুসরোজুরদ, বিসতাম, দামিগান, রায়, জানজান, হামাজান, আসাদাবাদ, জাই, হারাত, বাওয়ান, বাগ, বুশানজ, সারাখস, নুকান, সিমনান, আবহার, মারান্দ, খুওয়াই, জারবাজাকান, মুশকান, রোজরাওয়ার, হুলওয়ান, আরজিশে হাদিস শুনেছেন।

তিনি আম্বার, রাফেকাহ, রাহবাহ, মারদিন, মাকিসিন ইত্যাদি অনেক শহরে হাদিস শুনেছেন। বিশাল বিশাল শহর ও দেশ তিনি সফর করেছেন। অনেক দূরের শহরও তিনি বাদ দেননি। শুধু কোনো পরহেজগার ব্যক্তিকেই তিনি সফরসঙ্গী বানিয়েছেন। তিনি এমন দৃঢ়চেতা ছিলেন যে, কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে না পৌঁছে তিনি ক্ষান্ত হতেন না।

তার শায়খ খতিব আবুল ফজল তোসি রহ. বলেন, বর্তমানে হাফেজ উপাধিটি সে ছাড়া আর কেউ পাওয়ার যোগ্য বলে আমার জানা নেই। ইবনুন নাজ্জার রহ. বলেছেন, তিনি স্ব-যুগের ইমামুল মুহাদ্দিসিন ছিলেন। মুখস্থশক্তি, আয়ত্তশক্তি, উলুমুল হাদিসের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, নির্ভরযোগ্যতা, সম্ভ্রান্ততা, সুলিখন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও সর্বশেষ মনীষী।

ইবনুন নাজ্জার রহ. বলেন, আমাদের শায়খ আব্দুল ওয়াহাব ইবনে আমিনকে বলতে শুনেছি, একদিন আমি হাফেজ আবুল কাসেম ইবনে আসাকের রহ. ও আবু সাদ ইবনে সামআনি রহ.-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা হাদিস অন্বেষণ ও শায়খদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করছিলাম। রাস্তায় আমাদের জনৈক শায়খের সাথে দেখা হলো। ইবনুস সামআনি রহ. তাকে থামালেন তার কাছে

পড়ার জন্য। এরপর তিনি তার ব্যাগে একটি জুজ খুঁজলেন, যা উক্ত শায়খ শুনেছেন। কিন্তু পেলেন না। যার দরুন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ইবনে আসাকের তাকে বললেন, কোন জুজটি তিনি শুনেছেন? ইবনুস সামআনি বললেন, ইবনে আবি দাউদের 'কিতাবুল বাসি ওয়ান নুশুর'। তিনি আবু নসর জাইনাবি রহ.-এর কাছে সেটা শুনেছেন। ইবনে আসাকের রহ. বললেন, চিন্তা করো না। অতঃপর তিনি পুরো কিতাবটা বা কিংদংশ মুখস্থ পড়লেন। ইবনুন নাজ্জার রহ. বলেন, আমার শায়খের সন্দেহ।

ইমাম নববি তার ব্যাপারে বলেছেন, তার হস্তলিপি থেকেই আমি নকল করেছি। তিনি শামের হাফেজ বরং সারা দুনিয়ার হাফেজ ছিলেন। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম, নির্ভরযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত মনীষী ছিলেন।

ইবনে আসাকের রহ.-এর শ্রোত হাদিসের কপিগুলো পৌঁছতে বিলম্ব হওয়া ও না পৌঁছা পর্যন্ত এর জন্য তার চরম অস্থিরতা

তার ছেলে হাফেজ আবু মুহাম্মদ কাসেম রহ. বলেন, আমার আব্বা অনেক কিতাব শুনেছিলেন, যেগুলোর কপি তিনি তৈরি করেননি তার সহপাঠী হাফেজ আবু আলি ইবনুল ওয়াজির রহ.-এর কপিগুলোর ওপর নির্ভর করে। ইবনুল ওয়াজির রহ. যেগুলোর কপি তৈরি করতেন আমার আব্বা সেগুলোর কপি নকল করতেন না। আর আমার আব্বা যেগুলোর কপি নকল করতেন ইবনুল ওয়াজির সেগুলোর কপি তৈরি করতেন না।

একদা কোনো এক রাতে তাকে শুনেছি। তিনি জামে মসজিদে চাঁদের আলোতে তার এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিলেন। তিনি বলেন, আমি সফর করেছি, কিন্তু যদি না করতাম তা-ই ভালো হতো। অনেক কিতাব পড়েছি, কিন্তু যদি না পড়তাম তা-ই ভালো হতো! আমি ধারণা করেছিলাম, আমার সাথি ইবনুল ওয়াজির রহ. আমার শ্রোত কিতাবগুলো নিয়ে আসবে। যেমন : সহিহ বুখারি, মুসলিম, বায়হাকির কিতাবগুলো, উঁচু সনদের আজজাগুলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে মারু এলাকায় স্থায়ী হয়ে গেছে, সেখানেই সে অবস্থান করবে। আমার কিতাবগুলো আর নিয়ে আসবে না।

আমি আশা করেছিলাম যে, আমার আরেক সাথি হয়ত আসবে। তার নাম ইউসুফ ইবনে ফারওয়া জাইয়ানী রহ.। এবং আমাদের আরেক সাথি আবুল

হাসান মুরাদি রহ. আসার কথা ছিল। সে আমাকে বলে ছিল, আমি দামেশকে যাবো, কিন্তু কই! কেউ তো দামেশকে আসল না। তাই আমার তৃতীয়বার সফর করতে হবে। বড়ো বড়ো কিতাবগুলো ও গুরুত্বপূর্ণ আজজাগুলো আনতে হবে।

অল্প কিছু দিন পরেই তার এক বন্ধু আসল। তার দরজায় কড়া নাড়ল। সে বলল, আবুল হাসান মুরাদি এসেছে। আমার পিতা তার কাছে নেমে গেলেন। তাকে স্বাগত জানিয়ে তার বাড়িতে সসম্মানে অবস্থান করালেন। সে চার বস্তা ভরে তার শ্রোত কিতাবগুলো নিয়ে আসল। আমার পিতা দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। এবং আল্লাহর শুকর আদায় করলেন যে, তিনি অতি সহজে কোনো কষ্ট ছাড়াই তার শ্রোত কিতাবগুলো এনে দিলেন। তার আর সফর করতে হবে না। এরপর তিনি কিতাবগুলোর কপি তৈরি করতে শুরু করলেন। যখনই কোনো একটি জুজ এর কপি তৈরি করে শেষ করতেন মনে হতো যেন তিনি সারা দুনিয়া অর্জন করে ফেলেছেন।" (ইবনে আসাকেরের আলোচনা শেষ হলো।)

পাঠক! এই মহান ইমাম হাফেজ ইবনে আসাকের. দামেশকি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ হলো। তাতে কত শত বিস্ময়কর অবাক করার মত দুর্লভ ঘটনাবলি আপনি দেখেছেন। যদি তিনি সময়ের সদ্ব্যাবহার না করতেন, যদি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গনিমত মনে না করতেন তাহলে এত বিশাল বিশাল গ্রন্থ তার দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভব হতো না। যা বর্তমানে কেনো একাডেমির পক্ষেও লেখা তো দূরের কথা ছাপাও সম্ভবপর হবে না। কাজেই ভাই! সময়ের হেফাজত করুন, সময়ই সকল বরকত ও কল্যাণের ভান্ডার।

ইমাম মুসলিম রহ.[৮]-এর মুতালাআর নিমগ্নতা

ইমাম মুসলিম রহ. ছিলেন হাদিসের জগতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা :

একবার তিনি হাদিসের মুতালাআয় খুব বেশি নিমগ্ন ছিলেন। তখন তার ক্ষুধাও লেগেছিল। পাশে খেজুরের একটি টুকরি রাখা ছিল। কিতাবের পাতা উল্টাচ্ছিলেন আর একটি করে খেজুর মুখে দিচ্ছিলেন। হাদিস মুতালাআয় তিনি এত বেশি মগ্ন ছিলেন যে, কী পরিমাণ খেজুর খেয়ে ফেললেন তা নিজেও বুঝতে

---

৮. হজরত ইবনে সিরিন রহ.-এর বর্ণনামতে তিনি ২০৬ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। রজব মাসের ২৫ তারিখ ২৬১ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

পারলেন না। এমনকি অতিরিক্ত খাবারের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ... অসুস্থতায় ইন্তেকাল করেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ-এর ইলমি মজলিস

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর দরবারে দরসে হাদিসের বড়ো মজলিস হতো। একবার দোয়াতের সংখ্যা গণনা করে সেখানে চল্লিশ হাজার দোয়াত পাওয়া গেল। সে সময় স্পিকার বক্স ছিল না। তাই হাদিসের দরসে নামাজের মুকাব্বিরের ন্যায় মুকাব্বির নিযুক্ত ছিল। সে মজলিসে বারোশ মুকাব্বির নিযুক্ত ছিল। যে মজলিসের মুকাব্বিরের সংখ্যা বারোশ, সে মজলিসের পরিধি কত বড়ো হবে? তারা এত বড়ো মজলিসে হাদিসের দরস প্রদান করতেন।

ইলমের প্রতি আকর্ষণ তো একেই বলে...

ইমাম মুহাম্মদ রহ. এক জায়গায় দরস দিতেন। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি বস্তি ছিল। সে বস্তির কিছু লোক তার কাছে এসে আবেদন করল, হজরত! আপনি আমাদের এখানে তাশরিফ আনুন। আমাদেরকে আপনার দরসে বসার সুযোগ করে দিন। তিনি বললেন, আমার হাতে সময় খুব কম। তারা বলল, হজরত! আমরা আপনার জন্য সওয়ারির ব্যবস্থা করব। এখানে পায়ে হেঁটে আসতে আপনার যে সময়টুকু ব্যয় হয়, সওয়ারিতে আরোহণ করে এসে সে সময়টুকু আমাদেরকে দিন।

তিনি তাদের এ প্রস্তাব কবুল করলেন। যখন তিনি সেখানে দরস প্রদান শুরু করলেন তখন তার দরসে হজরত ইমাম শাফি রহ.-ও উপস্থিত হলেন। তিনি আবেদন করলেন, হজরত! আমি আপনার নিকট অমুক কিতাবটি পড়তে চাই। তখন ইমাম মুহাম্মদ রহ. বললেন, ভাই! আমার হাতে তো সময় খুবই কম। আমাকে এখানেও পড়াতে হবে আবার ওই এলাকাতেও পড়াতে হবে। সুতরাং তোমাকে আলাদা সময় দেওয়ার মতো সময় তো আমার হাতে নেই। ইমাম শাফি রহ. বললেন, হজরত! আপনি এখান থেকে দরস শেষ করে যখন সওয়ারিতে আরোহণ করে ওই এলাকায় যাবেন, তখন আপনি সওয়ারিতে বসে বসে আমাকে দরস প্রদান করবেন। আর আমি দৌড়ে দৌড়ে আপনার দরস শুনব।

চিন্তা করুন! পৃথিবীতে ইলম ও জ্ঞানার্জনের প্রতি আকর্ষণের এরচে' উৎকৃষ্ট কোনো উদাহরণ আর কী হতে পারে? এটা হলো ইসলামের সৌন্দর্য।

ইলমের আকর্ষণে ঘুম উড়ে যায়

ইমাম মুহাম্মদ রহ. ছিলেন ইমাম শাফি রহ.-এর উস্তাদ। ইমাম শাফি রহ. বলেন, একবার আমার উস্তাদ ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর কাছে রাত্রিযাপনের সুযোগ হয়েছিল। আমি দেখলাম, তিনি এশার নামাজের পর বাতি জ্বালিয়ে কিছু সময় কিতাব অধ্যয়নের পর শুয়ে পড়লেন। এরপর কিছু সময় পরে তিনি উঠে বাতি জ্বালিয়ে কিছু সময় পড়লেন এবং বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি সারা রাত জেগেছিলাম। আমি দেখলাম, তিনি সারা রাতে সতেরো বার বিছানা থেকে উঠলেন এবং বাতি জ্বালিয়ে কিছু সময় কিতাব পড়ে আবার বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ইমাম শাফি রহ. বলেন, আমি সকালে হজরতকে জিজ্ঞাসা করলাম, হজরত! আপনি সারা রাতে সতেরো বার জাগ্রত হয়েছেন। তাহলে ঘুমিয়েছেন কখন? আমার প্রিয় শায়েখ তখন বললেন, আমি তো রাতে ঘুমাইনি। বরং সারা রাতে এক হাজার মাসআলার সমাধান বের করেছি।

আল্লাহু আকবার! এখন চিন্তা করুন তার অবস্থা। আর তিনি যে বারে বারে বাতি নিভিয়ে দিচ্ছিলেন, এর কারণ হলো, যাতে অযথা তেল না ফুরায়। অপচয় থেকে বাঁচা যায়।

জ্ঞানার্জনের মেহনত

আমাদের পূর্বসূরিগণ এ ইলম অর্জনের জন্য এত পরিশ্রম করেছেন যে, আজ আমরা তাদের পরিশ্রম ও কীর্তি শুনে বিস্মিত হই। চিন্তা করা যায়! ইমাম শাফি রহ. মাত্র তেরো বছর বয়সে 'ইমাম' হয়েছিলেন। তেরো বছর বয়সে কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জন করে মানুষকে হাদিসের দরস প্রদান করেছিলেন। এ ছিল তাদের ইলম অর্জনের মেহনত। ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই তারা জ্ঞানের সমুদ্রে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্তিম মুহূর্তেও ইলমের প্রতি আকর্ষণ

হজরত আবু ইউসুফ রহ. যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তার এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, আরোহী অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম নাকি পায়ে হাঁটা অবস্থায়? ছাত্র বলল, আরোহী অবস্থায়। তিনি বললেন, না। তখন ছাত্র আবার বলল, পায়ে হাঁটা অবস্থায়। তিনি তখনও বললেন, না। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, আরোহী অবস্থায় কখন কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম আর পায়ে হেঁটে কখন উত্তম? এ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন।

মুমূর্ষু অবস্থায় এ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করার কারণ কী? ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্ন করেছেন আবার এর জবাবও লিখেছেন। মুমূর্ষু অবস্থায় শয়তান মানুষের কাছে আসে। হয়তো তার কাছেও অভিশপ্ত শয়তান এসেছিল। যখন তিনি শয়তানকে দেখতে পান তখন মাসআলা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এ মাসআলার অসিলায় হয়তো আল্লাহ তাআলা তাকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করেছেন।

যে পথের পথিক আমরা

হজরত বায়েজিদ বোস্তামি রহ.-এর ব্যাপারে হজরত জুনাইদ বাগদাদি রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে যেমন অন্য সকল ফেরেশতাদের ওপর মর্যাদাবান করেছেন, তদ্রূপ হজরত বায়েজিদ বোস্তামি রহ.-কেও আওলিয়ায়ে কেরামের ওপর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন।

হজরত জুনাইদ বাগদাদি রহ. আরও বলেন, বোস্তামি রহ. যখন শৈশবে পিতাকে হারান, তখন তার মা তাকে মাদরাসায় ভর্তি করেন এবং শিক্ষককে বলেন, আমার সন্তানকে আপনার নিকটেই রাখবেন। বাড়িতে বেশি যেতে দেবেন না। কারণ, এর দ্বারা তার ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বোস্তামি রহ. এভাবে মাদরাসায় থাকতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ মায়ের কথা খুব মনে হলো। মাকে দেখতে ইচ্ছা হলো। তিনি শিক্ষকের নিকট বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। শিক্ষক বললেন, যদি তুমি এ পরিমাণ সবক শোনাতে পারো, তাহলে ছুটি পাবে। তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। শিক্ষকের নির্ধারিত পরিমাণ সবক শুনিয়ে দিয়ে ছুটি পেলেন। বাড়িতে গিয়ে দরজায় নক করলেন। তখন তার মা অযু করছিলেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন, কে।

তিনি বললেন, আমি বায়েজিদ। মা বললেন, আমারও একটি ছেলে আছে। তার নামও বায়েজিদ। আমি তাকে আল্লাহর রাস্তায় অর্পণ করেছি। তাহলে তুমি কোন বায়েজিদ? বালক বায়েজিদ রহ.-এর বুঝাতে আর বাকি রইল না যে, আমি দরজায় কোনো শব্দ করি, এটা মা চান না। বরং মা চান আমি মাদরাসায় ফিরে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি। তিনি সোজা মাদরাসায় ফিরে গেলেন। এরপর তিনি 'বায়েজিদ বোস্তামি' হওয়ার আগ পর্যন্ত মাদরাসা থেকে আর কোথাও যাননি। আল্লাহ তাআলা তাকে জমানার বায়েজিদ বানিয়েছিলেন।

ইলমের তৃষ্ণায় জেলখানায় অবস্থান

হজরত ইমাম তাইমিয়া রহ.-এর জীবনীতে পাওয়া যায়। একবার তৎকালীন সময়ের বাদশাহ তার নিকট কোনো বিষয়ের ফতওয়া চাইলেন। কিন্তু তিনি ফতওয়া দেননি। ফলে বাদশাহ তাকে জেলখানায় বন্দি করেন।

এরপর জেলখানায় কেটে গেল টানা তিনটি দিন। একদিন বাদশাহ সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় রাজদরবারে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করল এক তালিবে ইলম। সে ছিল সুন্দর, সুদর্শন যুবক। তার চেহারায় ছিল মায়াবি ছাপ। তাকে দেখামাত্র রাজদরবারে উপস্থিত সকলেরই মায়ার উদ্রেক হলো। এমনকি রাজার মনেও তার প্রতি মায়া জন্মাল। রাজা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, হে যুবক! তুমি কাঁদছ কেন? তুমি এভাবে কেঁদো না। এখানে তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি কী চাও বলো, আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করব।

বাদশাহর অভয়বাণী শুনে যুবক বলল, বাদশাহ সালামত! আপনি আমাকে জেলখানায় বন্দি করুন। তার কথা শুনে বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, জেলখানায় যাওয়ার জন্য তুমি এমন উৎসুক কেন? যুবক বলল, আজ তিন দিন হলো আপনি আমার উস্তাদকে জেলখানায় বন্দি করে রেখেছেন। যার ফলে আমি আমার উস্তাদের নিকট থেকে সবক পড়তে পারছি না। আপনি যদি আমাকে জেলখানায় বন্দি করেন, তাহলে আমি সেখানে আমার উস্তাদের নিকট থেকে সবক পড়তে পারব। কারাবরণ করার কষ্ট আমার কাছে কোনো কষ্টই মনে হবে না।

এ তালিবুল ইলম ছিল হজরত তাইমিয়া রহ.-এর ছাত্র। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে এমন দৃশ্য দেখা যায় না। এমন চরিত্র আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। আমাদের সম্পর্ক বর্তমানে টিভি ও ছবির সঙ্গে। কুরআনের সঙ্গে আমাদের

কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআন খুলে দেখার সময়ও আমাদের নেই। কিছু পরিবার তো এমন রয়েছে, যাদের কুরআন শরিফ খুলে দেখার সময়ই হয় না।

ইলমের পিপাসা এমনও হয়?

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. যখন শেষ বয়সে উপনীত হলেন, তখন একদিন তার ছেলে হজরত শাহ আবদুল আজিজ রহ. ক্লাসে পাঠদান করা অবস্থায় পানি চাইলেন। এক ছাত্র দৌড়ে তার ঘরে গিয়ে বলল, শাহ সাহেব পানি চেয়েছেন। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. বললেন, আফসোস! আমার বংশ থেকে ইলম উঠে গেছে। তখন তার স্ত্রী বললেন, আপনি এ কথা বলার ব্যাপারে এত ত্বরা করবেন না। আগে বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করে দেখি। এরপর তিনি পানির গ্লাসে কিছু সিরকা মিশিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সিরকা সাধারণত তিক্ত ও ভিন্ন স্বাদের হয়ে থাকে। যা পানির স্বাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পানির গ্লাস শাহ আবদুল আজিজ রহ.-এর হাতে দেওয়ার পর তিনি তা পান করলেন। তারপর ক্লাস শেষ হওয়ার পর যখন ঘরে এলেন, তখন তার মা জিজ্ঞাসা করলেন, বেটা! তুমি যে পানি পান করেছ, তার স্বাদ কেমন ছিল? তিনি বললেন, মা! তা তো বলতে পারব না। তখন মা বাবার কাছে গিয়ে বললেন, দেখলেন তো! আবদুল আজিজ ইলমের প্রতি গাফলতির কারণে পানি পান করেনি; বরং সে তীব্র পানির পিপাসার কারণেই পানি পান করেছে। যা তার আসলেই প্রয়োজন ছিল। অন্যথায় হয়তো সে ক্লাস করাতে পারত না। সুতরাং আমাদের বংশ থেকে এখনো ইলমের আদব উঠে যায়নি। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বংশে সর্বদা ইলম ও ইলমের আদব জারি রেখো।

ফতওয়া পড়তে পড়তে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন

দারুল উলুম দেওবন্দের এক মুফতি সাহেবের জীবনালেখ্য পাওয়া যায় যে, তার মৃত্যুর পর তার বুকের ওপর একটি ফতওয়ার কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ফতওয়া পড়তে ছিলেন। ফতওয়া পড়া অবস্থায় তিনি

মৃত্যুবরণ করেন। আর ফতওয়ার কাগজটি তার হাত থেকে বুকের ওপর পড়ে যায়।

আমাদের আকাবিরে দীন এভাবেই সময়কে গনিমত মনে করতেন। ইবাদতের মাধ্যমে সময়কে ব্যয় করতেন।

এমনও জ্ঞানপিপাসু ছিল তখন

হজরত শাহ আবদুল কাদের রায়পুরি রহ.[৯] বলেন, আমি ভর্তির জন্য দারুল উলুম দেওবন্দে গেলাম। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর নাজেমে তালিমাত সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, ভর্তি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি হজরতকে খুব বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলাম, হজরত! আমি কি জানতে পারি ভর্তি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কী? নাজেম সাহেব আমাকে বললেন, আসলে আমাদের এখানে ছাত্রদের কোনো বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা নেই। গ্রামবাসী যে কজন ছাত্রের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে, সে কজন ছাত্রকেই ভর্তি করি। অন্যদের ফিরিয়ে দিই। তখন আমি বললাম, হজরত! আমার খাবারের দায়িত্ব যদি আমার নিজের ওপর থাকে, তাহলে কি আমি ভর্তি হতে পারব? তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে। অবশেষে আমি ভর্তি হলাম। আর আমি সারা দিন ক্লাস করতাম, রাতে তাকরার করতাম। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন আমি পাশের বস্তিতে অবস্থিত বাজারে যেতাম। বাজারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেখানে আমের খোসা, তরমুজের খোসা পাওয়া যেত। আমি সেগুলো কুড়িয়ে এনে ভালো করে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলতাম। এরপর সারা দিন ক্লাস করতাম। এটাই ছিল আমার সারা দিনের খাবার। এভাবে আমি সারা বছর অতিবাহিত করলাম। কিন্তু কোনো দিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতাম না।

চিঠির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতাম না

শাহ আবদুল কাদের রায়পুরি রহ.-এর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ছাত্রজীবনে যখন বাড়ি থেকে কোনো চিঠি আসত, তখন তা খুলতাম না। কারণ, ভাবতাম যদি চিঠিতে কোনো খুশির খবর থাকে তাহলে বাড়ি যেতে মন চাইবে। পক্ষান্তরে

---

৯. তাঁর জন্মের ব্যাপারে সঠিক কোনো তারিখ পাওয়া যায় না। তবে ধারণা মুতাবিক হজরত আলি মিয়া নদবি রহ. লিখেছেন, ১২৯০ হিজরি সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা-মাতা তার নাম রাখেন গোলাম জিলানি। কিন্তু তার মুরশিদ তার নাম রাখেন আবদুল কাদের। লাহোরে তিনি ইন্তেকাল করেন। জুমার দিন সুবহে সাদিকের সময় তাকে সমাহিত করা হয়। —سوانح رائے پوری

যদি কোনো দুঃখের খবর থাকে তাহলে পড়ালেখায় মন বসবে না। ফলে আমি ইলম থেকে বঞ্চিত হবো।

এভাবে সারা বছরের চিঠিগুলো জমা করে রাখতাম। অবশেষে শাবান মাসে বার্ষিক পরীক্ষার পর যখন অবসর হতাম, তখন সব চিঠিগুলো খুলে পড়তাম এবং এর একটা ফিরিস্তি তৈরি করতাম। যখন বাড়িতে যেতাম তখন খুশির সংবাদদাতাকে অভিনন্দন জানাতাম আর দুঃখের সংবাদদাতাকে সান্ত্বনা দিতাম। ফলে সবাই আমার ওপর খুশি হয়ে যেতেন। কিন্তু তাদের তো আর এটা জানা ছিল না যে, আমি তাদের চিঠি সবেমাত্র পড়েছি।

পৃথিবীতে যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন তারা ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে এমনই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রদের তো পড়াশোনার চেয়ে বাইরের কথাবার্তা শোনার প্রতি আগ্রহ বেশি। তাকরার করতে বসলে তাকরারের কথা শোনার চেয়ে বাইরের কথা বেশি শোনে। এমনকি তাকরারে বসে তো দেশের রাজনীতির সব ফয়সালাও হয়ে যায়। এর কারণ হলো, অনর্থক কথাবার্তার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে ইলম থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

যে কলমের বিশ্রাম নেই

এক মুহাদ্দিস সাহেবের জীবনীতে পাওয়া যায়, তিনি তার জীবনে এ পরিমাণ কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যদি তার গোটা জীবনের দিনগুলো হিসাব করা হয়, আর তার রচিত কিতাবগুলোর পৃষ্ঠা গণনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, প্রতিদিন গড়ে দশ পৃষ্ঠা করে লেখা হয়েছে। অথচ এটা কোনো মামুলি বিষয় ছিল না।

জন্মের পর থেকেই তো আর মানুষ লেখতে পারে না। বরং বারো/তেরো বছর জ্ঞানার্জনের পর থেকে হয়তো লেখেন। সুতরাং জ্ঞানার্জনের এ বছরগুলো যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে, দশের পরিবর্তে প্রতিদিন বিশ পৃষ্ঠা হয়ে যাবে। আমাদের দ্বারা বিশ পৃষ্ঠা লেখা তো দূরের কথা, বিশ পৃষ্ঠা ভালোভাবে বুঝে পড়াই তো অসম্ভব। যারা লেখক তারা হয়তো জানেন যে, দিনে এক পৃষ্ঠা লেখা কত কঠিন। সুতরাং চিন্তা করুন, তারা কী পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন।

সফরের প্রবল আগ্রহ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম[১০] সতেরো বছরের যুবক। এখনকার সময়ের সতেরো বছরের কোনো যুবককে যদি ঘরের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সে হয়তো তা ঠিকমতো পালন করতে পারবে না, অথচ সতেরো বছরের যুবক মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ছিলেন প্রধান সেনাপতি।

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, রাজা দাহিরের মতো প্রতাপশালী শাসকের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আমি সিন্ধু এলাকায় সেই স্থান দেখেছি যেখানে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও রাজা দাহির যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। যুদ্ধের ময়দান এতটাই বিস্তৃত যে, ময়দান দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি চিন্তা করলাম, এ নওজোয়ান কীভাবে এখানে এসেছিলেন? তার সাথে তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তেমন কোনো সৈন্যদলও ছিল না।

যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বললেন, এখন আমাদের সকল সৈন্যরা বিভিন্ন অভিযানে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আমাদের কিছুসংখ্যক মহিলা সমুদ্রপথে আসছিল। পথিমধ্যে রাজা দাহিরের জলদস্যুবাহিনী তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে। তারা চিৎকার করে বলছিল, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম 'আমাদের বাচাঁও', 'আমাদের বাচাঁও'—এ বাক্যগুলো শুনে "Cornernee lings"-এর নওজোয়ানদের একত্র করলেন। তারা যদিও যুদ্ধে পরিপক্ব ছিলেন না, কিন্তু ইমানি বলে বলীয়ান ছিলেন। তাই তারা ইমানের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম! আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আমরা যাব। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, মুসলিম বোনদের আকুতির এ বাক্যগুলো মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের মাথায় এমনভাবে বিদ্ধ ছিল যে, তিনি হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে বলতেন—

لبيك يا اختى 'لبيك يا اختى

'আমার বোন! আমি উপস্থিত। আমার বোন! আমি উপস্থিত।'

একপর্যায়ে তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে রাজা দাহিরের এলাকায় পৌঁছেন এবং রাজা দাহিরের সুসজ্জিত সৈন্যদের ছিন্নভিন্ন করে দেন। তিনি রাজা দাহিরকে

---

[১০]. মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ছিলেন সিন্ধু-বিজেতা। ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের ইন্তেকালের পর তিনি জুলুমের শিকার হন। এবং সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের জমানায় তাঁকে শহিদ করে দেওয়া হয়। -তারিখে মিল্লাত : ১/৬৩৮।

গরাস্ত করেই ক্ষান্ত হননি; বরং নিজের আস্থাভাজনকে সেখানকার স্থলাভিষিক্ত করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এমনকি তিনি সিন্ধু থেকে মুলতান পর্যন্ত ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডীন করেন।

আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যদি এমন চেতনা বিরাজ করত, তাহলে পৃথিবীর কোনো অপশক্তিই আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পেত না। সুতরাং আমাদের শ্রম ও মেহনতকে কাজে লাগাতে হবে। আরাম-আয়েশের জীবন মূলত সফলতার জীবন নয়; বরং সফল জীবন তো হলো চেষ্টা-মুজাহাদা ও কর্মময় জীবন।

দরসের প্রতি আগ্রহের অনন্য দৃষ্টান্ত

হজরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ জলন্ধরি রহ.[১১] একবার হাদিসের দরসদানকালে এক ছাত্র প্রশ্ন করল। যে প্রশ্নের উত্তর তখন তার মাথায় আসছিল না। আমাদের যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে আমরা তো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এখানে যে আসলেই সূক্ষ্ম কিছু বিষয় আছে তা ছাত্রদের বুঝতেই দিই না। তখন ছাত্ররা আর কী করবে?

কিন্তু তিনি ছিলেন কঠিন আমানতদার। তিনি মনে করতেন যে, ছাত্ররা যদি উস্তাদকে কোনো প্রশ্ন করে, আর সে প্রশ্নের সমাধান উস্তাদের মাথায় তখন না আসার কারণে তিনি যদি তা এড়িয়ে যান, তাহলে এটা খিয়ানতের নামান্তর। তাই তিনি খোলাখুলি বলে দিলেন, এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান এখন আমার মাথায় আসছে না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ছাত্ররা চুপ করে বসে থাকল। আর তিনি বারবার এটা পড়ছিলেন। কখনো পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছেন, কখনো পড়ছেন। কিন্তু সঠিক কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি বললেন, এ প্রশ্নের সমাধান এখন আমি দিতে পারছি না। আমি অমুক আলেমের কাছে গিয়ে এর সঠিক সমাধান জেনে নেবো। যার কথা তিনি তার ছাত্রদের সামনে বললেন, তিনি ছিলেন তারই প্রাক্তন ছাত্র। এ কথা শুনে এক ছাত্র সেই আলেমের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, হুজুর আপনার কাছে এ ব্যাপারে আসছেন। মাওলানা সাহেব তৎক্ষণাৎ কিতাব বন্ধ করে হজরতের কাছে দৌড়ে গেলেন। বললেন, হজরত! আপনি কি আমায় স্মরণ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! মাওলানা, এ সবক আমার বুঝে আসছে না। দেখো তো এর সমাধান কী? মাওলানা সাহেব পড়ে বুঝতে পারলেন। কিন্তু

---

১১. ১৩১২ হিজরি মুতাবিক ১৮৯৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৯০ হিজরি সনের ২০ শাবান মুতাবিক ১৯৭০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি কথা ঘুরিয়ে বললেন, হজরত! আপনি যখন আমাদের পড়িয়েছিলেন তখন এভাবে বলেছিলেন।

দেখুন! তিনি কীভাবে ঘুরিয়ে কথা বললেন। নিজের দিকে নিসবত করে এটা বোঝাননি যে, আমার অনেক ইলম ও জ্ঞান আছে। আপনি আমার উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে বুঝতে এসেছেন।

তাদের পক্ষে এমন মনোভাব দেখানো ছিল খুবই সহজ। কারণ, তারা ছিলেন সংস্রবপ্রাপ্ত। তরবিয়তপ্রাপ্ত। এটাকেই বলে তাসাউফ। এটাই হলো নিজেকে বিলীন করে দেওয়া।

নেতৃত্বের ভুল জাতির ধ্বংসের কারণ

ওলামায়ে কেরামের জন্য সতর্কতার সাথে জীবন-যাপন করা অপরিহার্য। হজরত হাসান বসরি রহ. বলেন, একবার ছোট্ট একটি মেয়ে আমাকে উপদেশ দিয়েছিল। কেউ বলল, কী সেই উপদেশ? তিনি বললেন, একবার আমি মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছিলাম। তখন ছিল বৃষ্টির মৌসুম। সতর্কতার সাথে না হাঁটলে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। আমার পাশ দিয়ে এক বালিকা যাচ্ছিল। তখন আমি তাকে বললাম, বেটি! সাবধানে যেয়ো, দেখো যেন পা পিছলে না যায়। মেয়েটি বলল, জনাব! আমি তো সতর্কতা অবলম্বন করবই। তবে আপনি আরও বেশি সতর্ক থাকবেন। কেননা, আমি পিছলে পড়ে গেলে শুধু আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হব। পক্ষান্তরে আপনি পড়ে গেলে গোটা উম্মত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। আপনারা দৃঢ়তার সাথে শরিয়ত ও সুন্নাতের ওপর আমল করবেন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করবেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে 'কুরআন সৃষ্ট কি না'—এ মাসআলার ক্ষেত্রে এমনভাবে বেত্রাঘাত করা হতো যে, সে বেত্রাঘাত যদি কোনো হাতির গায়ে করা হতো, তাহলে হাতিও লাফিয়ে উঠত। তার শরীরে যে জায়গায় বেত্রাঘাত করা হতো, সে স্থানটুকু অবশ হয়ে যেত। তারপর সে অংশের গোশত কেটে মলম ও পট্টি বেঁধে দেওয়া হতো। দীনের জন্য তিনি কী পরিমাণ দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিলেন।

হজরত আবু হুরায়রা রাদি. মুখস্থশক্তি কোথায় পেলেন?

হজরত আবু হুরায়রা রাদি. মুসলমান হওয়ার পর তার বৃদ্ধকাল শুরু হয়েছিল। অধিকাংশ সময় তিনি ভুলে যেতেন। কিছু মনে রাখতে পারতেন না।

একদিন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কিছু মনে থাকে না। আমি আপনার বাণী যা শুনি ভুলে যাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার চাদরখানা মেলে ধরো। তিনি যখন চাদর মেলে ধরলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাতের ইশারা করলেন, যেন তিনি হাত ভরে চাদরে কিছু রাখছেন। এরপর বললেন, আবু হুরায়রা! চাদর বেঁধে নাও। এরপর থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন ধী-শক্তিসম্পন্ন করলেন যে, তিনি আর কিছুই ভুলতেন না।

সুবহানাল্লাহ! তিনি ইলম অর্জনের জন্য অগ্রসর হয়েছেন। আর উস্তাদ দোয়া করে দিয়েছেন। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করলেন। ফলে তিনি এমন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন যে, তার ব্যাপারে মুফতি শফি রহ.[১২] বলেন যে, আবু হুরায়রা রাদি. 'মৌলবি' ধরনের সাহাবি ছিলেন। কারণ, তিনি অধিকাংশ সময় হাদিস সংকলনের চিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন। এ জন্যই তিনি সকল সাহাবির চেয়ে অধিক হাদিস বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

মুখস্থ তো এমনই হওয়া চাই

একবার খলিফা আবদুল মালেক রহ. চিন্তা করলেন, হজরত আবু হুরায়রা রাদি. তো অধিক হাদিস বর্ণনাকারী। কিন্তু তিনি কি আসলে হুবহু হাদিসই বর্ণনা করছেন, নাকি রিওয়ায়াত বিল মানা তথা মর্ম ঠিক রেখে অন্য শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করছেন?

---

১২. তিনি ১৩১৪ হিজরিতে দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। নয় বছর বয়সে পিতার সাথে তিনি হজরত থানবি রহ.-এর খেদমতে হাজির হন। ১৩৪৯ হিজরিতে তিনি খেলাফতপ্রাপ্ত হন। ১৩৯২ হিজরির শাওয়াল মাসে ৮৩ বছর বয়সে করাচিতে ইন্তেকাল করেন।—بزم اشرف چراغ

এ সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি একটি মাহফিলের আয়োজন করেন। মাহফিলে হজরত আবু হুরায়রা রাদি.-কে দাওয়াত দেন। এদিকে খলিফা মজলিসের একপাশে পর্দার আড়ালে দুজন কাতেব নিয়োজিত করলেন। যাদেরকে আদেশ করলেন, হজরত আবু হুরায়রা রাদি. যা বলবেন, আপনারা তা সুন্দরভাবে হুবহু লিপিবদ্ধ করবেন। মাহফিল শুরু হলে খলিফা হজরত আবদুল মালেক রহ. বললেন, হজরত! আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদিস শুনেছেন। সেখান থেকে কিছু হাদিস শুনিয়ে আমাদেরকেও ধন্য করুন।

খলিফার অনুরোধে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. একশ হাদিস শুনিয়ে দিলেন। কাতেবদ্বয় একশ হাদিসই লিপিবদ্ধ করে রাখলেন।

এরপর এক বছর পর খলিফা পুনরায় একটি মাহফিলের আয়োজন করলেন। গত বছরের মতো এবারও হজরত আবু হুরায়রা রাদি.-কে দাওয়াত করলেন। আর সেই কাতেবদ্বয়কে বললেন, আপনারা গত বছরের নোটটা বের করে রাখবেন। আবু হুরায়রা রাদি. যা বলবেন, তার সাথে এ নোট মেলাবেন। এরপর খলিফা হজরত আবু হুরায়রা রাদি.-কে বললেন, হজরত! আপনি গত বছর যে হাদিসগুলো আমাদের শুনিয়েছিলেন, তা আমাদের বেশ ভালো লেগেছিল। আমরা উপকৃত হয়েছি। এবারও যদি সেই হাদিসগুলো আমাদের শুনাতেন, তাহলে আমাদের উপকার হতো। খলিফার অনুরোধে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. সেই হাদিসগুলো শোনালেন। কাতেবদ্বয় অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। একশ হাদিসের মধ্যে কোথাও একটি অক্ষরের মধ্যেও পরিবর্তন হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাকে এমন মুখস্থশক্তি দান করেছিলেন।

হাদিসের হাফেজ এমনও ছিলেন...

মুখস্থ-শক্তির নিয়ামত মুহাদ্দেসিনে কেরামের নসিব হয়েছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাউদ রহ. একবার ইস্পাহান গেলেন। সেখানকার ওলামায়ে কেরাম জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসের ছেলে হিসেবে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি আগমন করার পর সবাই অনুরোধ করলেন, আমাদেরকে কিছু হাদিস শোনান। হাদিস

শোনার আগ্রহে সকলেই একত্রিত হলো। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ রহ. সে মজলিসে ৩৫ হাজার হাদিস শুনিয়ে দিলেন।

ফকিহগণের তীক্ষ্ণ মেধা

সুলাইমান ইবনে মেহরান[১৩] ছিলেন বুখারির রিজালদের একজন। তিনি একবার হজরত আবু ইউসুফ রহ.-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি মাসআলাটির সমাধান বলে দিলেন। তখন তিনি আবু ইউসুফ রহ.-কে বললেন, আপনি এটা কোত্থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, হজরত! আমি এ হাদিস আপনার থেকেই শুনেছি।

তখন সুলাইমান ইবনে মেহরান বললেন, তোমার জন্মের পূর্ব থেকেই এ হাদিস আমার মুখস্থ। কিন্তু তুমি বলার দ্বারা এর সারমর্ম আমি ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছি। আসলে আমরা তো হলাম ফার্মেসির ন্যায় আর তোমরা হলে ডাক্তারের ন্যায়। তিনি আরও বলেন, আমরা হাদিসগুলো সঞ্চিত করে রাখি। আর কোন হাদিস থেকে কী মাসআলা বের হবে এটা তো তোমরাই ভালো জানো।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জ্ঞানের সূক্ষ্মতা

এক দম্পতির মাঝে মনোমালিন্যতা দেখা দিলো। স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাইল। কিন্তু স্ত্রীর মুখ গোমরা দেখে কথা বলল না। তখন স্বামী রাগ করে বলল, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না তুমি আমার সাথে কথা বলবে, ততক্ষণ আমিও তোমার সাথে কথা বলব না। এরপর স্ত্রীও কসম করে বলল, যতক্ষণ না তুমিও আমার সাথে কথা বলবে, ততক্ষণ আমিও তোমার সাথে কথা বলব না।

এরপর দুজনেই রাগ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন সকাল হলো তখন দুজনের রাগ কিছুটা প্রশমিত হলো। এর সমাধানের ব্যাপারে দুজনেই চিন্তিত হলো। তাই স্বামী এর সমাধান জানার জন্য সে সময়ের ফকিহ হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর দরবারে হাজির হলো। তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলল। সুফিয়ান সাওরি রহ. বললেন, দুজনের মাঝে যে-ই আগে কথা বলবে, সে-ই কসম ভঙ্গকারী হবে। এখন সমস্যা হলো দুটি :

---

১৩. তিনি ৬১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইলমে হাদিসে তার বিশেষ যোগ্যতা থাকার কারণে তাকে শায়খুল ইসলাম বলা হতো। তিনি ১৪৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।—سیر التابعین: ۲۰۱

এক. একদিকে কসম ভঙ্গকারী হবে।

দুই. কসম ভঙ্গকারীর সাক্ষ্য সমাজে গ্রহণ করা হয় না।

কাজেই দুজনের কারোরই ইচ্ছা ছিল না কসম ভঙ্গ করার। এদিকে কসম ভঙ্গ না করলে এর সমাধানও হচ্ছে না। তাই দুজনেই অস্থির, চিন্তিত। হঠাৎ স্বামীর মনে পড়ল ইমামে আজম হজরত আবু হানিফা রহ.-এর কথা। তিনি আবু হানিফা রহ.-এর কাছে গিয়ে ঘটনা খুলে বললেন। আবু হানিফা রহ. বললেন, তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে আগে কথা বলো এবং দুজনেই স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে থাকো। স্বামী বাড়িতে ফিরে এসে বলল, কী অবস্থা? তোমার মন-মেযায ঠিক তো? স্ত্রী তো সুযোগ পেয়ে গেল। বলল, তুমি তো কসম ভঙ্গকারী হয়ে গেলে। স্বামী বলল, না। আমি কসম ভঙ্গকারী হইনি। কারণ, এ মাসআলা আমাকে হজরত আবু হানিফা রহ. বলেছেন। আমি তার কাছে এ মাসআলা জানতে গিয়েছিলাম। সে সময়ে মানুষ মাসআলা জানতে অনেক বেশি আগ্রহী ছিল। স্ত্রী বলল, আচ্ছা! আমি নিজে গিয়ে এ মাসআলা জিজ্ঞাসা করব।

দুজনেই এ মাসআলা জানতে হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর কাছে গেল। স্বামী আবু হানিফা রহ.-এর প্রদত্ত ফতওয়া হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ.-কে বলল। মাসআলা শুনে হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. খুব রেগে গেলেন। বললেন, আরে! আবু হানিফা তো হারামকে হালাল বানিয়ে দিয়েছেন! চলো, আমিও তোমাদের সাথে যাব তার কাছে।

তিন জনই হাজির হলেন হজরত আবু হানিফা রহ-এর দরবারে। সুফিয়ান সাওরি রহ. বললেন, আবু হানিফা! আপনি তো হারামকে হালাল বানিয়ে দিয়েছেন? ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, হজরত! আমি তো হালালকে হালালই বলেছি। সুফিয়ান সাওরি রহ. বললেন, আপনি কী বলতে চান? তখন ইমামে আজম রহ. বললেন, আপনি আগে আমার কথা তো শুনুন, আমি কী বলেছি। তখন তিনি বললেন, প্রথমে স্বামী বলেছিল, তুমি যতক্ষণ আমার সাথে কথা না বলবে, ততক্ষণ আমিও তোমার সাথে কথা বলব না। স্বামীর এ কথা বলার পরই তো স্ত্রী কসম করেছিল। তাহলে আপনি বলুন তো, স্ত্রী কার সাথে কথা বলেছিল? স্ত্রী তো স্বামীর সাথেই কথা বলে কসম করেছে। সুতরাং স্ত্রী তো স্বামীর সাথে কথা বলেই ফেলেছে। তাই স্বামীর কসমও পূর্ণ হয়ে গেছে। তবে স্ত্রীর কসম এখনো রয়ে গেছে। তাই আমি স্বামীকে বলেছি, তুমি স্ত্রীর সাথে আগে কথা বলো। এভাবে কথা বলার দ্বারা স্ত্রীর কসমও পূর্ণ হয়ে গেল। তারা এখন আগের মতো জীবনযাপন করতে পারবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জ্ঞানের দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মতা ও গভীরতা দেখে সুফিয়ান সাওরি রহ. বিস্মিত হয়ে যান।

হজরত ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সামনে খলিফা মানসুর[১৪]

একবার খলিফা মানসুর ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাবি, ইমাম সাওরি ও অন্য এক ফকিহকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। কারণ, তিনি তাদের কোনো একজনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োজিত করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাব তারা মানতে অস্বীকার করছিল। অবশেষে রাজাদেশ অনুযায়ী তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। পথিমধ্যে ফকিহ সাহেব টয়লেটের কথা বলে কেটে পড়লেন। এরপর ইমাম আবু হানিফা রহ. কিয়াফা করে বললেন, আমার মনে হয় খলিফার কাছে গিয়ে আমি যে-কোনোভাবে মুক্তি পেয়ে যাব। ইমাম শাবিও মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু ফেঁসে যাবে ইমাম সাওরি রহ.।

বাস্তবে ঘটনা তাই ঘটল। তিনজনই খলিফার দরবারে হাজির হলেন। প্রথমে ইমাম শাবি রহ. শুরু করলেন। তিনি বললেন, খলিফা সাহেব! আপনি কেমন আছেন? আপনার পরিবার কেমন আছে? আপনার মহলের অবস্থা কী? আপনার ঘোড়া কেমন আছে? খলিফা অবাক হয়ে গেল। যাকে এনেছি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে সে কিনা সকলের সামনে জিজ্ঞাসা করছে, আমার ঘোড়া কেমন আছে? খলিফা চিন্তা করলেন, না, এ ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য নয়। তাই তিনি বললেন, না, আমি আপনাকে প্রধান বিচারপতি বানাব না।

এরপর খলিফা আবু হানিফা রহ.-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আবু হানিফা! আমি আপনাকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ প্রদান করলাম। হজরত আবু হানিফা রহ. কিছুটা সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, আমি প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য নই। খলিফা বললেন, না, না। আপনিই তার উপযুক্ত। এরপর আবু হানিফা রহ. বললেন, খলিফা সাহেব! এখন দুটি কথা। আমি যে কথাটি বলেছি সেটি হয়তো সত্য অথবা মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয় তাহলে তো আমি মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদী কখনো প্রধান বিচারপতি হওয়ার উপযুক্ত নয়। আর যদি আমি সত্যবাদী হই তাহলে তো আমি বলেই দিয়েছি আমি এর উপযুক্ত নই।

---

[১৪]. তিনি ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের জমানায় ৯৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ২২ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পর তিনি হজে যাওয়ার প্রাক্কালে বিরে মাউনার নিকটে জিলহজ মাসের দুই তারিখে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ হারুনুর রশিদের সাহেবজাদা। -তারিখে মিল্লাত : ৭৯

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জ্ঞানের দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মতা ও গভীরতা দেখে সুফিয়ান সাওরি রহ. বিস্মিত হয়ে যান।

হজরত ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সামনে খলিফা মানসুর[১৪]

একবার খলিফা মানসুর ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাবি, ইমাম সাওরি ও অন্য এক ফকিহকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। কারণ, তিনি তাদের কোনো একজনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োজিত করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাব তারা মানতে অস্বীকার করছিল। অবশেষে রাজাদেশ অনুযায়ী তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। পথিমধ্যে ফকিহ সাহেব টয়লেটের কথা বলে কেটে পড়লেন। এরপর ইমাম আবু হানিফা রহ. কিয়াফা করে বললেন, আমার মনে হয় খলিফার কাছে গিয়ে আমি যে-কোনোভাবে মুক্তি পেয়ে যাব। ইমাম শাবিও মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু ফেঁসে যাবে ইমাম সাওরি রহ.।

বাস্তবে ঘটনা তাই ঘটল। তিনজনই খলিফার দরবারে হাজির হলেন। প্রথমে ইমাম শাবি রহ. শুরু করলেন। তিনি বললেন, খলিফা সাহেব! আপনি কেমন আছেন? আপনার পরিবার কেমন আছে? আপনার মহলের অবস্থা কী? আপনার ঘোড়া কেমন আছে? খলিফা অবাক হয়ে গেল। যাকে এনেছি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে সে কিনা সকলের সামনে জিজ্ঞাসা করছে, আমার ঘোড়া কেমন আছে? খলিফা চিন্তা করলেন, না, এ ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য নয়। তাই তিনি বললেন, না, আমি আপনাকে প্রধান বিচারপতি বানাব না।

এরপর খলিফা আবু হানিফা রহ.-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আবু হানিফা! আমি আপনাকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ প্রদান করলাম। হজরত আবু হানিফা রহ. কিছুটা সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, আমি প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য নই। খলিফা বললেন, না, না। আপনিই তার উপযুক্ত। এরপর আবু হানিফা রহ. বললেন, খলিফা সাহেব! এখন দুটি কথা। আমি যে কথাটি বলেছি সেটি হয়তো সত্য অথবা মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয় তাহলে তো আমি মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদী কখনো প্রধান বিচারপতি হওয়ার উপযুক্ত নয়। আর যদি আমি সত্যবাদী হই তাহলে তো আমি বলেই দিয়েছি আমি এর উপযুক্ত নই।

---

১৪. তিনি ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের জমানায় ৯৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ২২ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পর তিনি হজে যাওয়ার প্রাক্কালে বিরে মাউনার নিকটে জিলহজ মাসের দুই তারিখে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ হারুনুর রশিদের সাহেবজাদা। -তারিখে মিল্লাত : ৭৯

হজরত আবু হানিফা রহ.-এর কথা শুনে খলিফা নির্বাক বনে গেলেন। তিনি যদি এখন বলেন আপনি মিথ্যাবাদী, তাহলেও আবু হানিফা মুক্তি পেয়ে যান। আর যদি বলেন আপনি সত্যবাদী, তাহলেও তিনি মুক্তি পেয়ে যান। এভাবে তিনি পুরো মজলিসকে নিরুত্তর করে দিলেন।

এক হাদিস থেকে ৪০টি মাসআলা ইসতিম্বাত

একবার ইমাম শাফি রহ. হজরত ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি সারা রাত জাগ্রত অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন। সকালে ইমাম মালেক রহ. বললেন, আপনি রাতে ঘুমাননি কেন? তিনি বললেন, আমার মাথায় একটি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

একবার হজরত আনাস রাদি.-এর ছোটো ভাইকে উদ্দেশ্যে করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

يَا اَبَا عُمَيْر مَا فَعَلَ النُّغَيْر

'হে আবু উমায়ের! তোমার পাখি কী করছে?'

বাচ্চাটির একটি পাখি ছিল। পাখিটি মরে গিয়েছিল। তারপর থেকে যখনই ছেলেটির সঙ্গে নবিজির দেখা হতো, তখনই তাকে খুশি করার জন্য নবিজি এ বাক্যটি বলতেন।

ইমাম শাফি রহ. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাক্য—

يَا اَبَا عُمَيْر مَا فَعَلَ النُّغَيْر

থেকে চিন্তা-গবেষণা করে ৪০টি মাসআলা উদ্ভাবন করেছি। যেমন : ছোটো বাচ্চাদের স্নেহের সাথে উপনামের ডাকা যাবে।

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! এ জন্যই তো ইমাম শাফি রহ. বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার স্মরণ ছাড়া দিন অতিবাহিত হয় না। আর রাতে তোমার সাথে গোপনে কথা বলা ছাড়া রাত কাটে না।

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর মুখস্থশক্তি

আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক ইলম দান করেছিলেন। একবার শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ. তার ছাত্রকে বললেন, বৃষ্টির মৌসুম শেষ হয়ে গেছে। বর্ষাকালে কিতাবাদি নরম থাকার কারণে তাতে পোকা ধরার সম্ভাবনা থাকে। তাই এখন আমার সব কিতাবগুলো ভালো করে রোদে দিয়ে শুকিয়ে ফেলো। কোনো পৃষ্ঠা ছেঁড়া-ফাটা থাকলে তাও ঠিক করে নাও। ছাত্র কিতাব রোদে দিতে গিয়ে দেখল একটি কিতাবের পাঁচ/ছয় পৃষ্ঠা পোকায় কেটে ফেলেছে। ছাত্র বলল, হজরত! এ কিতাবটির পাঁচ/ছয় পৃষ্ঠা পোকায় কেটে দিয়েছে। শায়খুল হিন্দ রহ. বললেন, এখানে পাঁচ/ছয় পৃষ্ঠা সাদা কাগজ লাগিয়ে দাও। ছাত্র হজরতের কথা অনুযায়ী পাঁচ/ছয় পৃষ্ঠা সাদা কাগজ লাগিয়ে কিতাব রোদে দিলো। কিতাব শুকিয়ে গেলে বলল, হজরত! এখন কী করব? তিনি বললেন, যে ইবারতটুকু নেই সেটুকু লিখে রাখো। ছাত্র বলল, হজরত! আমি এ কিতাবটি গত বছর পড়েছি, এখন আমার ভালো করে মনে নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন কিতাব? ছাত্র বলল, মাইবুজি। এটি একটি অত্যন্ত কঠিন কিতাব। শায়খুল হিন্দ রহ. বললেন, কোন জায়গা থেকে ইবারত নেই? ছাত্র বলার পর তিনি কলম হাতে নিয়ে সেখান থেকে পাঁচ/ছয় পৃষ্ঠা ইবারত লিখে ফেললেন। এ হলো তাদের ইলমের বরকত। কিতাব পড়ার পর বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তারপরও তাদের হুবহু মনে থাকে।

বিরল মুখস্থশক্তি

হজরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. ছিলেন মুখস্থশক্তির দৃষ্টান্তহীন ব্যক্তিত্ব। একবার তিনি মিশর গিয়েছিলেন। সেখানের একটি লাইব্রেরিতে 'নুরুল ইজাহ' নামের একটি কিতাব দেখতে পেলেন। তিনি সেখানকার দায়িত্বশীলদের বললেন, এ কিতাবটি কি নেওয়া যাবে? কারণ, আমাদের সংগ্রহে এ কিতাবটি নেই। তারা বলল, না। এরপর তিনি সেখান থেকে কিতাবটি ভালোভাবে মুতালাআ করলেন এবং দেশে ফিরে হুবহু ওই কিতাবটি লিপিবদ্ধ করলেন। এরপর আসল ও নকল একত্র করা হলে দুটির মাঝে কোনো পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হলো না। যা বর্তমান দরসে নেজামির সিলেবাসভুক্ত।

মুখস্থশক্তির পূর্ণতা

যখন ভাওয়ালপুরে খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে একটি মামলা চলছিল, বিরোধীপক্ষ তাদের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে মুসলমানদের আকিদা-পরিপন্থি একটি কিতাব পেশ করল। তখন জজ সাহেব বললেন, দেখেন! তারা তো আপনাদের কিতাব দ্বারাই দলিল পেশ করছে। হজরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. বললেন, কিতাবটি কি আমি একবার দেখতে পারি? জজ সাহেব কিতাবটি দেখার অনুমতি দিলেন। তিনি কিতাবটি দেখে বললেন, এ কিতাব হাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর লেখার সময় একটি লাইন বাদ পড়েছে। যার দরুন এখানে অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে। সুতরাং এ কিতাবের অন্য একটি কপি আনা হোক। পরে অন্য একটি কিতাব আনা হলে দেখা গেল আসলেই একটি লাইন বাদ পড়েছে। অবশেষে বিরোধী পক্ষের কৌশলে ভাটা পড়ল।

পরবর্তী সময়ে হজরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. বললেন, আজ থেকে সাতাশ বছর আগে আমি একবার এ কিতাবটি দেখেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আজও আমার তা মনে আছে। সুবহানাল্লাহ।

স মা প্ত

পূর্বসূরির ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলে গেলে যেকোনো জাতি খুব সহজেই দুমড়েমুচড়ে যায়। হারিয়ে ফেলে নিজ স্বকীয়তা। এভাবেই আস্তে আস্তে নিজ পরিচয় খুইয়ে আত্মপরিচয়হীন এক জাতিতে পরিণত হয়। মেরুদণ্ড সোজা করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বিলুপ্ত হয়ে যায় জগৎ এবং মানুষের স্মরণ থেকে।

ইসলামের বদৌলতে আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা এমন অনেক পূর্বসূরি দান করেছেন, যাদের ইতিহাস আজও আমাদের উজ্জীবিত করে। তাদের খোদাভীরুতা, ইলমপিয়াসা, দ্বীনদারিতা, অবিচলতা, বীরত্ব—আমাদের এমন কর্মপন্থা এবং দর্পণ তুলে ধরে—যার অনুসরণ আমাদের ইলমি যোগ্যতা, আমলি দৃঢ়তা, বীরত্ব এমন স্তরে উন্নীত করবে—দুনিয়ার অন্য কোনো জাতি চোখ তুলে তাকানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

সেইসব পূর্বসূরিদের জীবনকথা এবং তাদের চেষ্টা-সাধনার গল্প দিয়েই সাজানো হয়েছে অমূল্য এই গ্রন্থটি। তাদের ইলমি সাধনা, ত্যাগ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার সবক পাবেন বইটিতে; যা আপনাকে ইলম অর্জনের সফরে করবে আরও উজ্জীবিত এবং পুলকিত। ইলমি সফরের পাথেয়ের সন্ধানে অবগাহন করতে পারেন বইটিতে।

দারুত তিবইয়ান

নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন বুনন

কওমী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

যোগাযোগ : ০১৩১৫-৬০৫১৩৩

https://www.facebook.com/Daruttibyan